مسائل في العقيدة
وصفة الوضوء
وصفة صلاة النبي صلى اللّه عليه وسلم
والتحقيق الإيضاح لكثير من مسائل
الحج والعمرة والزيارة

لسماحة الشيخ العلامة
عبد العزيز بن عبداللّه بن باز
رحمه اللّه

আকীদা বিষয়ক মাসআলা-মাসায়েল
ওযু ও সালাতের বিবরণ
হজ, উমরা ও যিয়ারত
বহু বিষয়ের গবেষণা ও বিশ্লেষণ

মূলঃ শাইখ আল্লামা আবদুল আযীয বিন বায (রহঃ)
অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল কাফী
আবদুর রব আফফান

সূচীপত্র الفهارس

	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
১	ভূমিকা	৫
২	লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলীর বিবরণ ও এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ভয়াবহতা	৬
৩	আল্লাহর সাথে শিরক কথাটির ব্যাখ্যা	১৭
৪	গলায় বা হাতে সুতা বা তাগা বাঁধার হুকুম	২২
৫	যাদু ও যাদুকরদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান ও যাদুকৃত ব্যক্তির চিকিৎসার বিবরণঃ	২৫
৬	কাবা ঘরের দেয়াল ও তার গিলাফ স্পর্শ করার হুকুম	৩৫
৭	ওযুর পদ্ধতি	৩৯
৮	আযানের সময় ও আযানের পর কি দুয়া ও যিকির পাঠ করতে হ	৪৫
৯	মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হয়ঃ	৪৯
১০	নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সালাতের পদ্ধতি	৫১
১১	জানাযা সালাতের পদ্ধতি	৬৯
১২	হজ, উমরা ও যিয়ারত বহু বিষয়ের গবেষণা ও বিশ্লেষণ	৭৬
১৩	হজ ও উমরা ফরয হওয়ার দলীল ও তা দ্রুত আদায় করা	৭৮
১৪	হজের উদ্দেশ্যে সফরের পূর্বে পাপাচার হতে তাওবা ও সকল প্রকার যুলুম-অন্যায় থেকে মুক্ত হওয়ার অপরিহার্যতার বর্ণনা	৮৩
১৫	মীক্বাতে পৌঁছে হাজীদের জন্য যা যা করণীয়	৯১
১৬	মহিলাদের যে কোন পোশাকে ইহরাম বাঁধা জায়েয	৯৫
১৭	স্থানগত মীক্বাতসমূহ ও তার সীমারেখার বর্ণনা	৯৮
১৮	যারা হজের মৌসুম ছাড়া অন্য সময়ে মীক্বাতে পৌঁছে তাদের যা করণীয়	১০৫

	বিষয়ঃ	পৃষ্ঠাঃ
১৯	ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ও ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য যা বৈধ তার বর্ণনা	১১৩
২০	মক্কা শরীফে পৌঁছে হাজীদের জন্য যা করণীয়	১২২
২১	যিলহজ মাসের ৮ তারিখে হজের জন্য ইহরাম বেঁধে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়ম	১৩৪
২২	আরাফাতে অবস্থান	১৩৭
	১০ই যিলহজ মিনায় গমন এবং করণীয় বিষয়ের বর্ণনা	১৫৭
২৩	কুরবানীর দিনে হাজীদের জন্য করণীয় কার্যসমূহের সর্বোত্তম শ্রেণীবিন্যাস	১৬৬
২৪	ক্বিরান ও তামাত্তু হজ পালনকারীর উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গ	১৭৪
২৫	যিয়ারতের নিয়ম ও আদব	১৭৮
২৬	সতর্কতা	১৯৪
২৭	মসজিদে কুবা ও বাকী গোরস্থান যিয়ারত করা মুস্তাহাব	১৯৯
২৮	হাজী সাহেব ও অন্যদের উপর আবশ্যক হল আমর বিল মারূফ করা	২০৩
২৯	বিভিন্ন সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় অর্জন করা কর্তব্য	২১৪
৩০	সালাম ও সালামের জবাব, হাঁচির জবাব এবং রোগীর শুশ্রূষা	২১৬
৩১	দুআ ও যিকির	২২০

ভূমিকাঃ

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা। দরূদ ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর নীতি মেনে চলে তাদের সকলের উপর।
আবদুল আযীয বিন বায চেরিটেবল ফাউণ্ডেশনের গবেষণা পরিষদ আনন্দের সাথে পাঠকবৃন্দের সামনে এই সংকলনটি পেশ করছে। এটা হচ্ছে মাণ্যবর শাইখ আবদুল বিন বায (রহঃ)এর জ্ঞান ভাণ্ডার প্রকাশের অন্যতম একটি সিরিজ।

মূল্যবান এ সিরিজটি প্রকাশ করার ব্যাপারে যারা সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আর এ সিরিজটিকে উপকারী বিদ্যা হিসেবে মাণ্যবর শাইখের কবরে তার ছোয়াব জারি করে দিন।
আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে সুউচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউসে একত্রিত বসবাস করার তাওফীক দান করেন। নিশ্চয় তিনি এর তত্ত্বাবধায়ক ও এ কাজে পূর্ণ সক্ষম।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরামের উপর।

আকীদা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলীর বিবরণ ও এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ভয়াবহতা[1]

প্রশ্নঃ লক্ষ্য করা যাচ্ছে মুসলিম মিল্লাতের অনেক মানুষ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। যার ফলে এই কালেমার তাৎপর্য ও দাবীর বিপরীত বিভিন্ন কথা ও কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে তারা। অতএব লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রকৃত অর্থ কি? তার দাবী কি? আর এর শর্তাবলীই বা কি?

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাটিই হচ্ছে দ্বীনের মূল। এর সাথে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল স্বাক্ষ্য প্রদান সংযুক্ত হয়ে কালেমাটি ইসলামের প্রথম রুকন। যেমনটি আবদুল্লাহ বিন ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

ইসলাম পাচঁটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে,আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল (২) নামায প্রতিষ্ঠা করা (৩) যাকাত আদায় করা (৪) আল্লাহর ঘরের হজ্জ পালন করা (৫)

---

[1] . মাজমু ফাতাওয়া শাইখ বিন বায (১/২২৯-২৩৪) সংকলন:ড.তাইয়্যার এবং আহমাদ বিন বায। দারুল ওয়াতান। ছাপা ১৪১৬হিঃ। মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ শাইখ বিন বায। সংকলনঃ ড.শুআইয়ের ৭/৫৬-৬২)

রামাযানের রোযা রাখা।[1]

বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাস (রাঃ)থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুআয বিন জাবাল (রাঃ)কে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তাঁকে বলেন,

নিশ্চয় তুমি এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব (ইহূদী-খৃষ্টান)। তাদের সর্বপ্রথম আহবান জানাবে একথার স্বাক্ষ্য দিতে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। তারা যদি একথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে শিক্ষা দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তারা যদি এটা মেনে নেয়, তবে জানাবে যে আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের মধ্যকার ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদের মধ্যকার গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে।[2]" এ ক্ষেত্রে আরো অনেক হাদীছ আছে।

শাহাদাতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবূদ নেই। একথাটি আল্লাহ সুবহানাহু ব্যতীত অন্য সবকিছুর ইবাদত বা দাসত্বকে অস্বীকার করে এবং ইবাদত এককভাবে শুধু আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

---

[1]. বুখারী,কিতাবুল ঈমান,অনুচ্ছেদঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি, হা/৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান,অনুচ্ছেদঃ ইসলামের রুকন সমূহ ও তার বড় বড় ভিত্তি, হা/১৬।

[2]. বুখারী ও মুসলিম। বুখারী অধ্যায়ঃ যাকাত হা/১৩৯৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান। অনুচ্ছেদঃ শাহাদাতাইন ও ইসলামের মূলনীতি প্রতি আহবান। হা।১৯/

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

এসব এজন্য যে,আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে ডাকে তারা সবাই মিথ্যা। আর আল্লাহই পরাক্রমশালী ও মহান। (হজ্জঃ ৬২)

সূরা মুমিনূনে আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদকে ডাকে, যার পক্ষে তার কাছে কোন যুক্তি প্রমাণ নেই, তার হিসেব রয়েছে তার রবের কাছে। এ ধরনের কাফের কখনো সফলকাম হতে পারে না। (মুমেনূনঃ ১১৭)

সূরা বাকারায় আল্লাহ আরো বলেন,

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

তোমাদের আল্লাহ এক ও একক। সেই দয়াবান ও করুণাময় আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। (বাকারাঃ ১৬৩)

সূরা বাইয়্যেনাতে আল্লাহ বলেন,

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

তাদেরকে তো এছাড়া আর কোন হুকুম দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে

একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে। (বাইয়্যেনাহঃ ৫)

এ অর্থবোধক আয়াত অসংখ্য রয়েছে। এই মহান কালেমা থেকে পাঠকারী উপকৃত হবে না, শিরকের বৃত্ত থেকে মুক্তি পাবে না যতক্ষণ সে তার অর্থ না জানবে, সত্যায়ন না করবে এবং তার দাবী অনুযায়ী আমল না করবে।

মুনাফিকরা এই কালেমা পাঠ করেছে কিন্তু তারপরও তারা জাহান্নামের অতল তলে অবস্থান করবে। কেননা তারা অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করেনি এবং তার দাবী অনুযায়ী একনিষ্ঠভাবে আমল করেনি।

অনুরূপভাবে ইহূদীরাও কালেমাটি বলেছে। অথচ তারা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় কাফের। এ জন্যে যে তারা কালেমার দাবী অনুযায়ী আমল করেনি।

এমনিভাবে কবর পুজারীরা এবং উম্মতের নামধারী ওলীরা এই কালেমা পাঠ করে; কিন্তু কথা, কাজ ও বিশ্বাসে কালেমার বিপরীত চলতে থাকে। এ কারণে কালেমা তাদের কোন উপকার করবে না। কালেমা যতই পাঠ করুক তারা মুসলিম হতে পারবে না। কেননা কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে তারা কালেমাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

বিদ্বানগণ এই কালেমার শর্ত উল্লেখ করেছেন ৮টি।

(১) ইলম

(২) ইয়াকীন

(৩) ইখলাস

(৪) সত্যায়ন

(৫) ভালোবাসা

(৬) বশ্যতা স্বীকার

(৭) গ্রহণ করা

অষ্টম আরেকটি হচ্ছেঃ

(৮) আল্লাহ ব্যতীত সব কিছুকে অস্বীকার করা।

শর্তগুলোর সংক্ষেপ ব্যাখ্যাঃ

(১) ইলম। অর্থাৎ এমনভাবে কালেমার অর্থ জানা যাতে অজ্ঞতা বিদূরীত হয়। পূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, এই কালেমার অর্থ হল: আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ বা উপাস্য নেই। অতএব আল্লাহ ব্যতীত মানুষ আর যা কিছুর উপাসনা করে তা সবই বাতিল।

(২) ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাস যা সন্দেহের বিপরীত। অতএব এই কালেমা পাঠকারীর অন্তরে এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, আল্লাহ সুবহানাহুই প্রকৃত মাবূদ ও উপাস্য।

(৩) ইখলাস। অর্থাৎ বান্দা তার যাবতীয় ইবাদত খালেস তথা নির্ভেজালভাবে তার পালনকর্তা আল্লাহর জন্যই সম্পন্ন করবে। সে যদি ইবাদতের কোন কিছু আল্লাহ ব্যতীত কারো উদ্দেশ্যে করে যেমন নবী, ওলী, ফেরেশতা, মুর্তি বা জিন ইত্যাদি তবে সে আল্লাহর সাথে শিরক করল এবং ইখলাসের শর্তকে নষ্ট করে ফেলল।

(৪) সত্যায়ন। অর্থাৎ এমনভাবে এই কালেমা বলবে যে, সে তাতে সত্যবাদী থাকবে। তার অন্তর হবে মুখের কথার মোতাবেক। মুখের কথা হবে অন্তরের মোতাবেক। শুধু যদি মুখে উচ্চারণ করে আর অন্তর তার অর্থ ও তাৎপর্যের বিশ্বাস না করে, তবে কোন লাভ হবে না। ফলে অন্যান্য মুনাফেকদের মত সেও কাফেরে পরিণত হবে।

(৫) ভালোবাসা। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা রেখে এটা উচ্চারণ করবে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ভালবাসা না রেখে যদি এই কালেমা পাঠ করে, তবে কাফেরই থেকে যাবে। ইসলামে প্রবেশ করা হবে না। তবে তার হুকুম হবে অন্যান্য মুনাফেকদের ন্যায়।

এর প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। (আল ইমরানঃ ৩১) আল্লাহ সুবহানাহু আরো বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبّاً لِّلّهِ

কিছু লোক আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ দাঁড় করায় এবং তাদেরকে এমন ভালোবাসে যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা উচিত অথচ ঈমানদাররা সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে আল্লাহকে। (বাকারাঃ ১৬৫)

(৬) বশ্যতা স্বীকার ও আত্মসমর্পণ। এই কালেমার তাৎপর্যকে মেনে নেয়া। অর্থাৎ এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর শরীয়তের কাছে আত্মসর্পণ করা। তার প্রতি ঈমান আনবে এবং এ বিশ্বাস রাখবে যে এটাই প্রকৃত হক ও সত্য। যদি এই কালেমা মুখে উচ্চারণ করে কিন্তু আল্লাহর ইবাদত এককভাবে না করে, তাঁর

শরীয়তের কাছে আত্মসমর্পণ না করে; বরং তা থেকে অহংকার প্রদর্শন করে, তবে সে হবে এমন মুসলিম যেমন ছিল ইবলিস ও তার দলবল।

(৭) কবুল বা গ্রহণ করা। এই কালেমা দ্বারা যা প্রমাণ হয়, যেমন খালেসভাবে এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত সব ধরণের ইবাদতকে বর্জন করা। এই নীতিকেই আঁকড়ে থাকা ও তাতে সন্তুষ্ট থাকা।

(৮) আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তার সবকিছুকে অস্বীকার করা। অর্থাৎ গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং তা যে বাতিল তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে,যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনেন ও জানেন। (বাকারাঃ ২৫৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله» وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: **«مَنْ وَحَّدَ اللهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله »**

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করবে, তার জান ও মালে আক্রমণ করা হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু তার অন্তরের হিসাব আল্লাহর কাছে।

অন্য বর্ণনায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে এককভাবে মেনে নিবে এবং আল্লাহ ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করবে, তার জান ও মাল হারাম হয়ে যাবে; কিন্তু তার অন্তরের হিসাব আল্লাহর কাছে।[1]

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে উল্লেখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে এই কালেমাকে বাস্তবায়ন করা। যখনই কোন ব্যক্তি এর অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং সঠিক পথে চলবে, সে এমন মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে যার জান ও মাল হারাম হবে। যদিও সেই মুসলিম ব্যক্তি এই শর্তগুলোর বিস্তারিত বিবরণ না জানে। কেননা মূল কথা হচ্ছে সত্য জানা এবং তদানুযায়ী আমল করা, যদিও সবগুলো শর্তের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সে না জানে।

তাগূত বলা হয় প্রত্যেক ঐ বস্তুকে যার ইবাদত আল্লাহকে বাদ দিয়ে করা হয় এবং তাতে সে সন্তুষ্ট। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে,যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে)

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান। অনুচ্ছেদ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ বলা পর্যন্ত মানুষের সাথে লড়াই করার নির্দেশ। হা/২৩। আবু মালেক আশজাঈ তাঁর পিতা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

সবকিছু শোনেন ও জানেন। (বাকারাঃ ২৫৬)

আল্লাহ সুবহানাহু আরো বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ الله وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

আর আমি প্রত্যেক জাতির নিকট একজন রাসূল প্রেরণ করেছি এই আদেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাগূত থেকে বিরত থাকবে। (নাহালঃ ৩৬) আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য মাবূদগণ যদি উক্ত ইবাদতের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে, যেমন নবীগণ, সলেহীন, ফেরেশতা মণ্ডলী, প্রভৃতি তাঁরা তাগূত নন। অনেক মানুষ এদের ইবাদত করে থাকে; কিন্তু তাঁরা তাতে সন্তুষ্ট নন, তাই তারা তাগূতেরও অন্তর্ভুক্ত নন। মূলত: তাগূত হচ্ছে শয়তান। কেননা সেই তো এ সমস্ত ব্যক্তিদের ইবাদতের জন্য মানুষকে ডেকেছে। আর সুসজ্জিতভাবে বিষয়টিকে তাদের সামনে উপস্থিত করেছে। (আমাদের জন্য এবং সকল মুসলিমের জন্য প্রত্যেক খারাপ কাজ থেকে আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করছি।)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্টকারী ও আংশিক নষ্টকারী বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে:

প্রত্যেক কথা, কাজ ও বিশ্বাস যদি ব্যক্তিকে শিরকে আকবারে পতিত করে, তবে এর মাধ্যমে কালেমা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেমন কোন মৃত ব্যক্তি, ফেরেশতা, মুর্তি, গাছ, পাথর, তারকা প্রভৃতিকে ডাকা বা তাদের কাছে দুয়া করা। তাদের উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা, নযর-মানত করা বা সিজদা ইত্যাদি করা।

এ ধরণের কাজ তাওহীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কালেমা লা-

ইলাহা ইল্লাহ কে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দিবে। অনুরূপ কালেমা বিনষ্টকারী আরো বিষয় হচ্ছে, ইসলামের সুস্পষ্ট হারাম কোন বিষয়কে হালাল বিশ্বাস করা। যেমন ব্যভিচার, মদ্য বা মাদকদ্রব্য সেবন, পিতা-মাতার নাফরমানী, সুদ ইত্যাদি।

আরো বিষয় হচ্ছে, ইসলামের সুস্পষ্ট কোন আমল ও কথাকে অস্বীকার করা যা মেনে চলতে আল্লাহ আবশ্যক করেছেন। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়, যাকাত, রামাযানের সিয়াম, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ, শাহাদাতাইনকে মুখে উচ্চারণ ইত্যাদি।

আর যে সমস্ত কথা, কাজ ও বিশ্বাস মানুষের ঈমান ও তাওহীদকে দুর্বল করে দেয় এবং তাওহীদকে পূর্ণভাবে মেনে চলতে বাধা প্রদান করে তা অনেক প্রকারের। যেমন ছোট শিরক, রিয়া, গাইরুল্লাহর নামে শপথ, আল্লাহ এবং উমুক যা চায় এরূপ বলা, এটা আল্লাহ এবং উমুকের পক্ষ থেকে বলা। ইত্যাদি এরূপ আরো অনেক বিষয় যা ঈমানকে দুর্বল করে দেয় এবং তাওহীদকে কমজোর করে দেয়। তাওহীদকে পূর্ণরূপে মেনে চলার আবশ্যকতাকে ব্যাহত করে। অতএব তাওহীদ ও ঈমানের বিপরীত যে কোন বিষয় বা তাওহীদ ও ঈমানকে দুর্বল করবে এরকম সকল বিষয় থেকে সতর্ক থাকা সকলের উপর আবশ্যক।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে ঈমান হচ্ছে কথা, কাজ ও বিশ্বাসের নাম। যা ভাল কাজ করলে বৃদ্ধি পায় এবং মন্দ কাজ করলে হ্রাস পায়। এ কথার পক্ষে অনেক দলীল রয়েছে। উলামাগণ আকীদা, তাফসীর ও হাদীছের কিতাবগুলোতে তার বিবরণ বিস্তারিতভাবে প্রদান করেছেন। কেউ চাইলেই তা পেতে পারে। তন্মধ্যে কিছু দলীল নিম্নরূপঃ

আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

যখন কোন নতুন সূরা নাযিল হয় তখন তাদের কেউ কেউ (ঠাট্টা করে মুসলিমদের) জিজ্ঞেস করে বলে,এর ফলে তোমাদের কার ঈমান বেড়ে গেছে? (এর জবাব হচ্ছে) যারা ঈমান এনেছে (প্রত্যেকটি অবতীর্ণ সূরা) যথার্থই ঈমান বাড়িয়েই দিয়েছে এবং তারা এর ফলে আনন্দিত। (তাওবাঃ ১২৪)

আল্লাহ আরো বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

সাচ্চা ঈমানদার তো তারাই, আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে। (আনফালঃ ২)

তিনি আরো বলেন,

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

যারা সত্য-সঠিক পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে উন্নতি দান করেন। (মারয়ামঃ ৭৬)

توضيح معنى الشرك بالله

আল্লাহর সাথে শিরক কথাটির ব্যাখ্যা[1]

প্রশ্নঃ শিরক কাকে বলে? আল্লাহর এই বাণীটির তাফসীর কি? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে ওসীলা অনুসন্ধান কর। (মায়েদাঃ ৩৫)

উত্তরঃ শিরক হচ্ছে ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে অংশী স্থাপন করা। যেমন মুর্তি প্রভৃতির কাছে দুয়া করা। অথবা গাইরুল্লাহর কাছে উদ্ধার কামনা করা বা নযর-মানত করা বা সালাত আদায় করা বা তার জন্য সওম পালন করা বা তার উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা। যেমন মিসরের পীর বাদভীর মাজারে বা ইয়ামানের পীর ঈদরূসের মাজারে পশু যবেহ করা। অথবা কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা। অথবা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বা আবদুল কাদের জীলানী বা ঈদরূস বা অন্য কোন মৃত অনুপস্থিত মানুষের কাছে মদদ বা সাহায্য তলব করা। এসব কিছুকেই বলা হয় শিরক।

অনুরূপভাবে কেউ যদি নক্ষত্র বা জিনকে ডাকে বা তাদের কাছে উদ্ধার কামনা করে বা তাদের থেকে মদদ তলব করে। কেউ যদি এ ধরণের কোন ইবাদত জড় বস্তু বা মৃত ব্যক্তি বা অনুপস্থিত কারো উদ্দেশ্যে করে, তবে তা হবে আল্লাহর সাথে শিরক। আল্লাহ বলেন,

---

[1] . মাজমু ফাতাওয়া বিন বায (২/৭০৩-৭০৫) সংকলন: তাইয়্যার ও আহমাদ বিন বায।

وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

তারা যদি শিরক করে, তবে তাদের যাবতীয় আমল বরবাদ হয়ে যাবে। (আনআমঃ ৮৮)

আল্লাহ আরো বলেন,

ولَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

নিশ্চয় তোমার নিকট এবং তোমার পূর্বে সকল নবীর কাছে এ মর্মে ওহী করা হয়েছে যে, তুমি যদি শিরক কর, তবে তোমার আমল বরবাদ হয়ে যাবে। আর তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। (যুমারঃ ৬৫)

পূর্ণরূপে গাইরুল্লাহর ইবাদতও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তার এই আমলকে যেমন বলা হয় শিরক, তেমনি তাকে কুফরও বলা হয়। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ থেকে বিমুখ থাকবে, আর গাইরুল্লাহর ইবাদত করতে থাকবে যেমন, বৃক্ষ বা পাথর বা মুর্তি বা জিন বা কথিত ওলী নামে মৃত ব্যক্তি প্রভৃতির ইবাদত করবে, তাদের জন্য সালাত আদায় করবে, বা সিয়াম পালন করবে আর আল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবে, এটা সবচেয়ে বড় কুফরী ও কঠিন পর্যায়ের শিরক। (আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই)

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে এবং বলবে যে মাবূদ বলতে কিছু নেই, পার্থিব জীবনটাই আসল যেমন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও ধর্মদ্রোহীরা আল্লাহর অস্তিত্বক অস্বীকার করে থাকে। এরা মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় কাফের, সবেচেয়ে বড় বিভ্রান্ত ও সবচেয়ে বড় শিরকে লিপ্ত। (আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা চাই) মোট কথা এই বিশ্বাসগুলো এবং

এধরণের আরো যা আছে সবগুলোকে বলা হয় শিরক এবং আল্লাহর সাথে কুফরী।

কিছু মানুষ অজ্ঞতা বশতঃ মৃতদের কাছে দুয়া করা ও তাদের কাছে উদ্ধার কামনাকে বলে থাকে ওসীলা। তাদের ধারণা মতে এরূপ ওসীলা ধরা জায়েয। কিন্তু এটা মারাত্মক ভুল। কেননা এ ধরণের ওসীলা আল্লাহর সাথে বড় শিরকে অন্তর্গত। যদিও কোন কোন জাহেল ও মুশরিক এটাকে জায়েয ওসীলা বা মাধ্যম বলে থাকে। কেননা আগের যুগের মুশরিকদের ধর্মই তো ছিল এই ওসীলা। যে কারণে আল্লাহ তাদেরকে দোষারোপ করেছেন ও তিরস্কার করেছেন। ওসীলার ব্যাপারে এই ভ্রান্ত ধারণাকে প্রতিবাদ করার জন্য ও তা থেকে মানুষকে সতর্ক করার জন্যই রাসূল পাঠিয়েছেন এবং আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন।

কুরআনের সূরা মায়েদায় যে ওসীলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে ওসীলা অনুসন্ধান কর। (মায়েদাঃ ৩৫)

এখানে ওসীলার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধান করা। আর এই নৈকট্য পাওয়া যাবে তাঁকে সন্তুষ্টকারী আমলের মাধ্যমে। সকল বিদ্বানের নিকট ওসীলার এটাই সঠিক অর্থ। যেমন সালাত আল্লাহর নৈকট্য দানকারী একটি আমল, অতএব এটা একটা ওসীলা। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য পশু যবেহ করা একটি ওসীলা। যেমন সাধারণ কুরবানী ও হজ্জের কুরবানী। সিয়াম একটি ওসীলা। দান-সাদকা ওসীলা। আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত ওসীলা। এটাই হচ্ছে ওসীলার সঠিক অর্থ। আল্লাহ বলেন, হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর কাছে ওসীলা অনুসন্ধান কর।

(মায়েদাঃ ৩৫) অর্থাৎ তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান কর তাঁকে সন্তুষ্টকারী আমলের মাধ্যমে। এই তাফসীর করেছেন ইবনে কাছীর, ইবনে জারীর ত্বাবারী ওইমামগণ। প্রমূখ বাগাভী

অতএব আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আনুগত্যপূর্ণ কর্মের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান কর। তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ তোমাদের জন্য যে সকল আমল বিধিবদ্ধ করেছেন তার দ্বারা তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান কর। যেমন সালাত, সিয়াম, দান-সাদকা প্রভৃতি।

অনুরূপ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর অপর আয়াতের। আল্লাহ বলেন,

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

এরা যাদেরকে ডাকে তারা তো নিজেরাই নিজেদের রবের নৈকট্য লাভের উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছে যে, কে তাঁর নিকটতর হয়ে যাবে এবং এরা তাঁর রহমতের প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত। (বানী ইসরাঈলঃ ৫৭)

একইভাবে নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীগণ আল্লাহর অনুমদিত মাধ্যম দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেছেন। যেমন, জিহাদ, সওম, সালাত, যিকির, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল মানুষ ধারণা করে যে, ওসীলা মানে মৃত পীর-ওলীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাদের নিকট থেকে উদ্ধার কামনা করা, তদের এই ধারণা বাতিল। কেননা এটাই ছিল মুশরিকদের আকীদা-বিশ্বাস। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন,

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء

شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ

এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর ইবাদত করছে যারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী। (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতিবাদ করে বলেছেন,

قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছো যার অস্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং যমিনেও না! তারা যে শিরক করে তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র এবং তার উর্ধ্বে। (সূরা ইউনুসঃ ১৮)

গলায় বা হাতে সুতা বা তাগা বাঁধার হুকুম[1]

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি বিপদ মুক্তির জন্য অথবা বিপদ প্রতিহত করার জন্য সুতা বা তাগা পরিধান করে তার হুকুম কি?

উত্তরঃ তার এ কর্মে প্রতিবাদ করতে হবে। কেননা এটা শিরকে আসগার বা ছোট শিরক, যা তাবীজ ব্যবহারের অন্তর্গত। আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করবে, আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পুরন না করেন। যে ব্যক্তি ওয়াদাআ ব্যবহার করবে (সাগর থেকে সংগ্রহ করা ঝিনুক সদৃশ্য এক ধরণের বস্তু, যার মালা বানিয়ে মানুষ বদনযর থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে) আল্লাহ যেন তাকে শান্তি না দেন।[2]

অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করবে, সে শিরক করবে।[3] হুযায়ফা (রাঃ) জনৈক অসুস্থ লোকের নিকট গিয়ে দেখতে পান লোকটি জরের প্রকোপ থেকে মুক্তির জন্য সুতা লটকিয়ে পরিধান করেছে। তিনি সেটা কেটে ফেললেন এবং প্রতিবাদ করলেন। তারপর এই আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ তাদের অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান আনা সত্ত্বেও তারা মুশরিক। (ইউসুফঃ ১০৬) এ ঘটনায় হুযায়ফা সুস্পষ্ট করে দিলেন যে এরূপ কাজ শিরক।

---

1. ফতোয়া নূরুন আলাদ দারব ১/৩১৩। সংকলন: মুহাম্মাদ বিন শওয়াইয়ের। দারুল ইফতা প্রকাশনী।

2. মুসনাদ আহমাদ, হা/৪/১৫৪, উক্ববা বিন আমের রা.কর্তৃক বর্ণিত।

3. মুসনাদ আহমাদ, হা/৪/১৫৬, উক্ববা বিন আমের রা.কর্তৃক বর্ণিত।

অতএব সূতা বা তাগা ব্যবহার করা, ঝিনুকের তাবিজ বা হাড়ের তাবিজ বা বাঘের চুল বা হাড় বা দাঁত ইত্যাদি দ্বারা বানানো তাবিজ সবই জাহেলিয়াতের কুসংস্কার এবং গর্হিত কাজ।

অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াত লিখে তাবিজ ব্যবহারও জায়েয নয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর নিষেধাজ্ঞা ব্যাপক অর্থবোধক,তিনি কুরআন বা এরকম অন্য কিছুকে এই নিষেধাজ্ঞা থেকে ব্যতিক্রম বলেননি। তাছাড়া কুরআন দ্বারা তাবিজ ব্যবহার মানুষকে অন্যান্য বস্তুর তাবিজ ব্যবহারের দিকে ধাবিত করবে,ফলে এর মাধ্যমে শিরকের দরজা উন্মুক্ত হবে। এই জন্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয় ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ ও তাগা বা পৈতা ইত্যাদি শিরক।[1]

ঝাড়-ফুঁক বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, শরীয়তে পরিচিত নয়, এমন দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা। অতএব শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। ছোট বাচ্চাদের বদনযর থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে যে তাবিজ ব্যবহার করা হয় অথবা নারীদের বা অসুস্থদের জিন থেকে রক্ষার জন্য যে তাবিজ ব্যবহার করা হয়.. ইত্যাদি সবই গর্হিত ও জাহেলিয়াতের কাজ।

তেওয়ালাঃ স্বামীকে স্ত্রী থেকে দূরে সরানোর জন্য বা উভয়ের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য যা করা হয় তা যাদুর অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা শিরকে মধ্যে শামিল করেছেন। কেননা এতে জিন-শয়তানদের সহযোগিতা নেয়া হয়। যাদুকর বা

[1]. মুসনাদ আহমাদ ১/৩৮১, আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা। অনুচ্ছেদঃ তাবিজ লটকানো। হা/ ৩৮৮৩। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা। অনুচ্ছেদঃ তাবিজ লটকানো। হা/ ৩৫৩০। আবদুল্লাহ বিন মাসউদের স্ত্রী (রা.) থেকে হাদীছটি বর্ণিত।

যাদুকারীনী জিন-শয়তানদের ইবাদত এবং তাদেরকে সন্তুষ্টকারী কাজ করতে না পারলে যাদুই করতে পারবে না।

সুতা বা তাগাঃ এগুলোও তাবিজের প্রকারের মধ্যে শামিল। কেউ যদি হাতে বা গলায় সুতা লটকিয়ে ধারণা করে যে এর মাধ্যমে আরোগ্য পাওয়া যাবে, তবে সে গর্হিত কাজ করবে। তার ঐ সুতা কেটে ফেলা ওয়াজিব।

حكم السحر والسحرة وبيان علاج المسحور

যাদু ও যাদুকরদের ব্যাপারে ইসলামের বিধান এবং যাদুকৃত ব্যক্তির চিকিৎসার বিবরণঃ[1]

প্রশ্নঃ এ যুগে যাদুর প্রচলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। মানুষ যাদুকরদের নিকট যাচ্ছেও অনেক বেশী। ইসলামে এর হুকুম কি? কোন মানুষ যাদুতে আক্রান্ত হলে তার শরীয়ত সম্মত চিকিৎসা কি?

উত্তরঃ যাদু একটি বড় গুনাহ, ধ্বংসকারী পাপ; বরং ইসলাম ধ্বংসকারী অন্যতম একটি কারণ। আল্লাহ তাঁর সম্মানিত কিতাবে বলেন,

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

আর এই সঙ্গে তারা এমন সব জিনিসের অনুসরণ করাতে

[1] মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ শাইখ আবদুল আযীয বিন বায (৭/৭৮-৮৩)

মেতে ওঠে, যেগুলো শয়তানরা পেশ করতো সুলাইমানী রাজত্বের নামে। অথচ সুলাইমান কোন দিন কুফরী করেনি। কুফরী করেছে সেই শয়তানরা, যারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো। তারা ব্যবিলনে দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা আয়ত্ব করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। অথচ তারা(ফেরেশতারা) যখনই কাউকে এর শিক্ষা দিতো, তাকে পরিষ্কার ভাষায় এই বলে সতর্ক করে দিতোঃ দেখো, আমরা নিছক একটি পরীক্ষা মাত্র, তুমি কুফরীতে লিপ্ত হয়ো না। এরপরও তারা তাদের থেকে এমন জিনিস শিখতো, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এনে দিতো। একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর হুকুম ছাড়া এ উপায়ে তারা কাউকেও ক্ষতি করতে পারতো না। কিন্তু এ সত্ত্বেও তারা এমন জিনিস শিখতো যা তাদের নিজেদের জন্য লাভজনক ছিল না বরং ছিল ক্ষতিকর। তারা ভালো করেই জানতো, এর ক্রেতার জন্য আখেরাতে কোন অংশ নেই। কতই না নিকৃষ্ট জিনিসের বিনিময়ে তারা বিকিয়ে দিল নিজেদের জীবন!হায়, যদি তারা একথা জানতো!

যদি তারা ঈমান ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান লাভ করতো এটি তাদের জন্য হত বেশী ভালো। হায়,যদি তারা একথা জানতো। (বাকারাঃ ১০১-১০২)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা জানিয়েছেন যে, শয়তানরাই মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয়। আর এ কারণে তারা কুফরী করেছে।

ফেরেশতা দুজন যখন মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, বলে দিত তারা যা শিক্ষা দিচ্ছে তা কিন্তু কুফরী আর তারা দুজন মানবজাতির জন্য ফেতনা বা পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহ জানাচ্ছেন যে, যারা যাদু শিক্ষা গ্রহণ করে তারা এমন জিনিস শিক্ষা করে যা তাদের কোন

ক্ষতি করতে পারবে না এবং উপকারও করতে পারবে না। আর পরকালে আল্লাহর কাছে কোন অংশ নেই। অর্থাৎ পরকালে কল্যাণের কোন অংশই তারা লাভ করতে পারবে না।

আল্লাহ আরো জানাচ্ছেন যে,যাদুকররা যাদুর ক্রিয়ার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজ করে। অথচ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তারা কারো কোন ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তক্বদীরে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতে যদি ক্ষতি লিখা থাকে, তবেই এই যাদুর কারণে ক্ষতি হবে। অন্যথা যাদুতে আল্লাহর অনুমতি নেই। তিনি তক্বদীরে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তা ব্যতীত তাঁর পৃথিবীতে কোন কিছু ঘটবে না। আল্লাহ আরো বর্ণনা করেছেন যে, যাদু ঈমান ও তাকওয়ার খেলাফ।

এই আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হল যে,যাদু কুফরী ও ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন। তথা কেউ ইসলামের দাবী করে অতঃপর এই যাদুতে লিপ্ত হয়, তবে ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে।

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুারইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قُلْنَا وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন,

(১) আল্লাহর সাথে শিরক করা (২) যাদু করা। (৩) আল্লাহ যাকে

হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে বিনা অধিকারে হত্যা করা। (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করা (৬) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা (৭) সতী-সাধ্বী নিরাপরাধ মুমিন নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।[1]

এই হাদীছটিতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বর্ণনা করে দিলেন যে, শিরক ও যাদু সাতটি ধ্বংসাত্মক অপরাধের মধ্যে অন্যতম। তবে এগুলোর মধ্যে শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ। যাদুও তারই অন্তর্ভুক্ত। এই জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাদুকে শিরকের সাথেই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া যাদুকররা জিন-শয়তানদের ইবাদত ব্যতীত কখনই যাদু করতে পারবে না। তারা যা পছন্দ করে সে অনুযায়ী যাদুকররা কাজ করে থাকে। জিনদেরকে বিশেষ নামে ডাকে, তাদের উদ্দেশ্যে পশু বা মুরগী যবেহ করে, মানত করে, তাদের কাছে সাহায্য চায়.. এভাবে বিভিন্ন শিরকী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা যাদু ক্রিয়ায় সফল হয়।

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ

যে ব্যক্তি সুতায় ফুঁ দিয়ে গিরা দেয়, সে যাদু করে। আর যে যাদু করে সে শিরক করে। যে ব্যক্তি (আরোগ্যের উদ্দেশ্যে) কোন কিছু

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ ওসীয়ত। অনুচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করে..[নিসাঃ ১০] আয়াতের ব্যাখ্যা। হা/২৭৬৬। মুসলিম, অধ্যায়: ঈমান, অনুচ্ছেদ: কাবীরা গুনাহ সমূহ এবং সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি তার বিবরণ, হা/৮৯।

শরীরে লটকিয়ে রাখবে, তাকে ঐ বস্তুর প্রতি সোপর্দ করা হবে।[1]

একথার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সূরা ফালাকেঃ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁৎকারকারীনীদের অনিষ্ট থেকে। (ফালাকঃ ৪)

তাফসীরবিদগণ বলেন,তারা হচ্ছে যাদুকারীনী,যারা গিরা দেয় এবং তাতে শিরকী কথা বলে ফুঁৎকার দেয়। ঐ শিরকের মাধ্যমে তারা জিনদের নৈকট্য অর্জন করে, ফলে শয়তানরা যাদুকরদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মানুষকে কষ্ট দেয়।[2]

যাদুকরদের শাস্তি কি?এ সম্পর্কে উলামাগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেছেন, যাদুকরকে তাওবা করতে বলা হবে, সে যদি তাওবা করে, তবে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। কেউ বলেছেন, যাদুকর প্রমাণিত হলে সে তাওবা করুক না করুক তাকে হত্যা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা তার বেঁচে থাকাটা ইসলামী সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ। কেননা সাধারণত তারা তাওবায় সত্যবাদী হয় না। তাছাড়া তাদের বেঁচে থাকাটা মুসলিমদের জন্য বিরাট বড় হুমকী স্বরূপ। এ মত পোষণকারীদের দলীল হচ্ছে,আমীরুল মুমেনীন ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) যাদুকরদের তাওবার আদেশ ছাড়াই হত্যা করতে হুকুম জারি করেছেন। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা যাদের সুন্নাতের অনুসরণ করার আদেশ করেছেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)[3]।

---

[1] . নাসাঈ, অধ্যায়ঃ রক্তপাত হারাম। অনুচ্ছেদঃ যাদুকরের ব্যাপারে হুকুম হা/4079।

[2] . তা দেখুন তাফসীর ইবনে জারীর তাবারী ২৪/৭০৪। তাফসীর ইবনে কাসীর ৮ ।৫২৬/ ।৫৯৬/৮ভী তাফসীর বাগা

[3] এরবায বিন সারিয়া (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, আমার সুন্নাত এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাত আঁকড়ে ধরা। হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ ৪/১২৬। আবু

আরেকটি দলীল হচ্ছে, ইমাম তিরমিযী জুনদুব বিন আবদুল্লাহ বাজালী বা জুনদুব আল খাইর আল আযদী (রাঃ) থেকে মারফূ ও মাওকূফ সূত্রে বর্ণনা করেন। যাদুকরের দণ্ড হচ্ছে তরবারী চালিয়ে থাকে হত্যা করা। কোন কোন বর্ণনায় আছে, যাদুকরের দণ্ড হচ্ছে তরবারীর এক কোপে তাকে হত্যা করা।[1]

উম্মুল মুমেনীন হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক যাদুকারীনী দাসীকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। যে তাঁকে যাদু করেছিল। তখন তাকে তাওবা করতে না বলেই হত্যা করা হয়েছিল।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাওবা করার হুকুম না দিয়েই যাদুকরকে হত্যা করার কথা তিনজন সাহাবী থেকে সহীহ সূত্রে পাওয়া যায়। তাঁরা হচ্ছেন, ওমার, জুনদুব ও হাফসা (রাঃ)।

উল্লেখিত আলোচনায় বুঝা গেল যাদুকরদের কাছে যাওয়া জায়েয নয়। তাদেরকে কোন কিছু জিজ্ঞেস করা ও তাদেরকে সত্যায়ন করাও জায়েয নয়। অনুরূপভাবে জায়েয নয় গণক ও জ্যোতিষীদের কাছেও যাওয়া।

আবশ্যক হচ্ছে, যখনই যাদুকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে যে, সে যাদু করেছে বা সে যাদুর কথা স্বীকার করবে অথবা শরীয়ত সম্মত উপায়ে প্রমাণ করা সম্ভব হবে যে সে যাদু করেছে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। তাকে তাওবা করার হুকুম দেয়ার দরকার নেই। [2]

দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাত। অনুচ্ছেদঃ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। হা/৪৬০৭। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ইলম গ্রহণ হা/২৬৭৬।

[1] . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ হুদুদ বা দণ্ড। অনুচ্ছেদঃ যাদুকরের দণ্ড। হা/১৪৬০।

[2] . এ শাস্তি তার উপর দণ্ড স্বরূপ। সে যদি তাওবা করে, তবে সেটা তার ব্যাপার। কিন্তু তাওবা তার দণ্ডকে মওকুফ করবে না। সে তাওবায় সত্যবাদী হলে এবং আল্লাহ তা

যাদুর চিকিৎসাঃ

শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক ও বৈধ উপকারী ঔষধের মাধ্যমে চিকিৎসা করতে হবে। ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে সবচেয়ে উপকারী চিকিৎসা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

এই সূরা, আয়াত ও দুয়া সমূহ পড়ে রুগীকে ফুঁ দিবে।

(১) সূরা ফাতিহা

(২) আয়াতুল কুরসী

(৩) যাদুর আয়াত সমূহ। সূরা আরাফঃ **১১৭-১১৯**, সূরা ইউনুসঃ **৭৬-৮১**, সূরা ত্বাহা ৬৫-৬৯।

(৪) সূরা কাফেরূন

(৫) সূরা ইখলাস

(৬) সূরা ফালাক

(৭) সূরা নাস

এই সূরাগুলো তিনবার করে পাঠ করা মুস্তাহাব। সেই সাথে নিম্নলিখিত সহীহ সনদে বর্ণিত দুয়াগুলোও পাঠ করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রুগীদের চিকিৎসায় এই দুয়াগুলো পাঠ করতেন।

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً

কবুল করলে সে পরকালের মুক্তি পেতে পারে।

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বান নাস, আযহিবিল বাস এশফে আন্তাশ শাফী লা শিফাআ ইল্লা শিফাউকা শিফাআন লা য়ুগাদেরু সাকামা।

অর্থঃ হে মানুষের প্রভু,বিপদ দূরীভূত করে দাও,আরোগ্য দান কর- এমন আরোগ্য যার পর আর কোন রোগ অবশিষ্ট না থাকে,কেননা তুমিই একমাত্র আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কারো আরোগ্য নেই।[1] তিনবার।

নিচের এই দুয়াটি পড়েও ঝাড়-ফুঁক করবে। এই দুয়াটি পড়ে জিবরীল (আঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ঝাড়-ফুঁক করেছেন।

بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حاَسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

উচ্চারণঃ বিস্মিল্লাহি আরক্বিকা মিন কুল্লি শাইয়িন য়ুযীকা ওয়া মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আয়নিন হাসেদিন,আল্লাহু য়াশফীকা বিসমিল্লাহি আরক্বিকা।

অর্থঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি- তোমাকে কষ্টদানকারী সকল বস্তু হতে,এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা হিংসুক ব্যক্তির নযরের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ্ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।[2] তিনবার।

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ চিকিৎসা। অনুচ্ছেদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ঝাড়-ফুঁক হা/৫৭৪৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম অনুচ্ছেদঃ রুগীকে ঝাড়-ফুঁক করা মুস্তাহাব হা/২১৯১। এ বর্ণনাটি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর। ইমাম বুখারী আনাস (রাঃ) থেকেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন,হা/৫৭৪২।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ চিকিৎসা, রোগ ও ঝাড়-ফুঁক। হা/২১৮৬। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

আল্লাহর হুকুমে এই দুয়াটি সবচেয়ে উপকারী।

যাদুর চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোন বস্তু সম্পর্কে যদি ধারণা সৃষ্টি হয় যে তাতে যাদু করা হয়েছে, চাই তা পশম হোক বা গিরা লাগানো সুতা বা অনুরূপ কিছু, তবে ঐ বস্তুকে নষ্ট বা ধ্বংস করে দিতে হবে। সেই সাথে যাদুকৃত ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য যাথাযথ পরিচর্যা করতে হবে। যেমন এই দুয়া পড়ে তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ

উচ্চারণঃ আউ-যু বিকালিমা-তিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা খালাক্ব।

অর্থঃ আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে -তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে।[1]

এই দুয়াটি সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে পড়বে। পূর্ববর্তী শেষের তিনটি সূরা সকাল-সন্ধ্যা ফজর ও মাগরিবের পর তিনবার করে পড়বে, এবং আয়াতুল কুরসী পড়বে প্রত্যেক সালাতের পর ও ঘুমানোর সময়।

আরো মুস্তাহাব হচ্ছে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দুয়াটি তিনবার পাঠ করা।

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِيْ الأَرْضِ وَلاَ فِيْ السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হিল্লাযী লা- ইয়াযুররু মাআসমিহি শাইয়্যুন ফিল আরযি ওয়ালাফিস সামায়ি ওয়াহুওয়াস সামী-উল আলী-ম।

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির ও দুয়া,অনুচ্ছেদঃ আশ্রয় প্রার্থনা করার দুয়া।হা/২৭০৮।

অর্থঃ শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে,যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তুই কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী।[1]

এই দুয়াগুলো পাঠ করার সাথে সাথে মহান আল্লার উপর সুধারণা পোষণ করতে হবে। এই বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহই সকল কারণ সৃষ্টিকারী। তিনিই একমাত্র রুগীকে আরোগ্য দিতে পারেন যদি ইচ্ছা করেন। এই দুয়া ও ঔষধ সমূহ শুধু উপকরণ। আল্লাহই হচ্ছেন প্রকৃত আরোগ্য দানকারী।

তাই এই উপকরণগুলোর উপর ভরসা না করে এককভাবে আল্লাহর উপরই ভরসা করবে। আর বিশ্বাস রাখবে যে আল্লাহ চাইলে এই উপকরণগুলো দ্বারা ফায়দা হতে পারে, তিনি চাইলে ফায়দা নাও হতে পারে। কেননা প্রত্যেক বস্তুতে আল্লাহর বিশেষ হেকমত আছে যা শুধু তিনিই জানেন, অন্য কেউ জানে না। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি সবকিছু সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। তিনি কিছু দিলে কেউ তা বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না, তিনি বাধা দিলে কেউ তা প্রদানের ক্ষমতা রাখে না। তিনি যা ফায়সালা করেন তা প্রতিরোধ করার শক্তি কারো নেই। সকল ক্ষমতার অধিকারী তিনি, সকল প্রশংসার মালিকও তিনি। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। মহাপবিত্র তিনিই সকল তাওফীক দাতা।

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া পড়বে। হা/৫০৮৮। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদঃ সকালে পঠিতব্য দুয়া হা/৩৩৮৮। উছমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

حكم التمسح بحيطان الكعبة وكسوتها

কাবা ঘরের দেয়াল ও তার গিলাফ স্পর্শ করার হুকুমঃ[1]

প্রশ্নঃ কাবা ঘরের দেয়াল, গিলাফ, মাকামে ইবরাহীম ও হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার হুকুম কি?

উত্তরঃ বিদআত। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ করেননি। আর তিনি এরশাদ করেছেন,

যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমার নির্দেশনা নেই তবে তা প্রত্যাখ্যাত।[2]

তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে,যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।[3]

তিনি আরো বলেছেন,

দ্বীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবন থেকে সাবধান। কেননা প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবন বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।[4]

---

1 . ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব। বৈঠক নং ৫১৮।

2 . বুখারী, মুআল্লাক সনদে, অনুচ্ছেদঃ শাসক যদি বিচার করতে ইজতেহাদ করে। হা/৬৯১৭, ৯৬১৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ বিচার-ফায়সালা, অনুচ্ছেদঃ বাতিল হুকুমকে ভঙ্গ করা এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয় প্রত্যাখ্যান করা। হা/১৭১৮। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

3 . বুখারী, অধ্যায়ঃ সুলহ বা মিমাংসা। অনুচ্ছেদঃ যদি জুলুমের উপর মিমাংসা হয়, তবে মিমাংসা প্রত্যাখ্যাত। হা/২৫৫০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ বিচার-ফায়সালা, অনুচ্ছেদঃ বাতিল হুকুমকে ভঙ্গ করা এবং নতুন উদ্ভাবিত বিষয় প্রত্যাখ্যান করা। হা/১৭১৮। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

4 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাত। অনুচ্ছেদঃ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা। হা/৪৬০৭। তিরমিযী,

কাবা ঘরের দেয়াল ও গিলাফ স্পর্শ করা দ্বারা যদি ঐ দেয়াল ও গিলাফেরই বরকত পাওয়ার উদ্দেশ্য করে, তবে তা শিরকে আকবার। কিন্তু যদি ধারণা করে যে বস্তুগুলো বরকতপূর্ণ। তা স্পর্শ করা আল্লাহই বিধিবদ্ধ করেছেন এবং এই দেয়াল বা গিলাফ চুম্বন করা শরীয়ত সম্মত, তবে এই ধারণা ও কাজ বিদআত। কিন্তু স্পর্শ করে ঐ বস্তুর বরকত কামনা করে, তবে বড় শিরক হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই।

তবে হজরে আসওয়াদকে চুম্বন বা স্পর্শ করা শরীয়ত সম্মত। আর রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন ব্যতীত শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ করা সুন্নাত। স্পর্শ করার সময় বলবে, বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার। কিন্তু রুকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করবে না। ওমার (রাঃ) হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার সময় বলেছিলেন,

«إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ، وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ»

আমি জানি তুমি একটি পাথর, কোন উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখ না। যদি না দেখতাম যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তোমাকে চুম্বন করছেন, তবে তোমাকে চুম্বন করতাম না।[1] এই কারণে আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর

অধ্যায়ঃ ইলম। অনুচ্ছেদঃ সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরা ও বিদআত বর্জন করা। হা/২৬৭৬। এরবায বিন সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজরে আসওয়াদের আলোচনা। হা/১৫২০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা মুস্তাহাব। হা/১২৭০।

অনুসরণে শুধু হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করব, পাথর থেকে বরকত চাইব না। আমরা এই আমলগুলো করব শুধু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর আদর্শ মেনে এবং সুন্নাতের অনুসরণার্থে। কেননা তিনি বলেছেন, «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জ-উমরার নিয়ম-কানুন শিখে নাও।[1] তিনি আরো বলেছেন, « صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي » তোমরা ঠিক সেইভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখছ।[2]

অতএব আমরা সালাত আদায় করব, হজ্জ করব ঠিক সেইভাবে যেভাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন। তাই আমরা মাকামে ইবরাহীম, কাবা ঘরের দেয়াল, গিলাফ ইত্যাদি স্পর্শ করব না। এ সকল স্থান স্পর্শ করার কোন দলীল নেই। তাই এরূপ করা বিদআত। কিন্তু মুলতাযিমের সামনে দাঁড়িয়ে দুয়া করা ইবাদত। মুলতাযিম হচ্ছে হাজরে আসওয়াদ ও দরজার মধ্যবর্তী স্থানের নাম। সেখানে দাঁড়ানো সুন্নাত ও ইবাদত। তবে এই দাঁড়ানো কাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে নয় বা বরকত কামনার জন্য নয়; বরং আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশার্থে এরূপ করবে। অনুরূপভাবে কাবা ঘরের ভিতরে যদি প্রবেশ করে, তবে তার চার কোণায় তাওয়াফ করবে, তাকবীর পড়বে এবং বুক লাগিয়ে ও হাত দিয়ে ধরে দুয়া করবে। এরূপ কাজ কাবা ঘরের ভিতরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[1] . মুসলিম,অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা মুস্তাহাব। হা/১২৯৭। জাবের (রাঃ)থেকে বর্ণিত।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ মুসাফিরের আযান। হা/৬০৫।

ওয়া সাল্লাম) করেছেন। এতে কোন সমস্যা নেই। এগুলো আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নৈকট্য লাভের আমল।

ওযুর পদ্ধতি [1]

ওযু সালাতের পূর্বশর্ত। ওযু ব্যতীত সালাত বিশুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য তৈরী হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দুটি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো, তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং পা দুটি টাখনু পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো। (মায়েদাঃ ৬)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল হবে না।[2] তিনি আরো বলেন,« لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » ওযু ভঙ্গ হলে ওযু না করা পর্যন্ত তোমাদের কারো সালাত আল্লাহ কবুল করবেন না।[3] অতএব ওযু একটি আবশ্যিক ইবাদত।

প্রথমতঃ কোন মানুষ যদি পেশাব-পায়খান করে তবে পানি দ্বারা ইস্তেনজা করবে। কিন্তু পানি না পেলে পবিত্র ইট বা পাথর বা মাটি বা শুস্ক টিসু দ্বারা কুলুখ নিবে। পেশাব-পায়খানার রাস্তা পরিস্কার করার জন্য তিনবার বা ততোধিকবার কুলুখ ব্যবহার করতে হবে।

---

[1] . মাজমু ফাতাওয়া শাইখ বিন বায, ১১/২১-২৪।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক। হা/২২৪। ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

[3] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু, অনুচ্ছেদঃ পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবুল হবে না। হা/১৩৫ মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ সালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক। হা/২২৫। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

যাতে করে উভয় অঙ্গ পেশাব বা পায়খানার চিহ্ন থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। কিন্তু পানি দ্বারা পরিস্কার করাই উত্তম। অবশ্য কুলুখ ও পানি একসাথে ব্যবহার করলে আরো পরিপূর্ণ হবে।

শরীয়ত সম্মত ওযুর পদ্ধতিঃ

১) ওযু শুরুর সময় বলবে বিসমিল্লাহ। কোন কোন বিদ্বান ওযু শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলেছেন।

২) দুহাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করবে। এরূপ ধৌত করা উত্তম।

৩) এরপর তিন চল্লু পানি নিয়ে তিনবার কুলি করবে ও নাক ঝাড়বে।

৪) মুখমণ্ডল ধৌত করবে তিনবার। উপরে কপালে চুল গজানোর স্থান থেকে নিয়ে থুতনীর নীচ পর্যন্ত এবং ডানে-বামে এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত ধৌত করবে।

৫) এরপর হাতের আঙ্গুলের প্রান্তভাগ থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত (কনুইসহ) ধৌত করবে। প্রথমে ডান হাত তারপর বা

ম হাত। নারী-পুরুষ একই নিয়ম।

৬) তারপর সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করবে এবং দুকান মাসেহ করবে। নারী-পুরুষ একই নিয়ম।

৭) এরপর প্রথমে ডান পা ধৌত করবে টাখনুসহ তিনবার অতঃপর বাম পা টাখনুসহ তিনবার।

কুলি করা, নাক ঝাড়া, মুখমণ্ডল, দুহাত ও দুপা ধৌত করা তিনবার করে করা সুন্নাত। কিন্তু দুকানসহ মাথা মাসেহ একবারই হতে হবে।। কিন্তু কেউ যদি একবার করে ধৌত করে এবং নির্দিষ্ট অঙ্গ ধৌত করা সম্ভব হয়,তবে একবারই যথেষ্ট। কিন্তু উত্তম হচ্ছে তিনবার তিনবার করে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি কখনো একবার একবার করে, কখনো দুবার দুবার করে, কখনো তিনবার তিনবার করে ধৌত করেছেন। আরো প্রমাণিত আছে যে, তিনি একই ওযুতে কোন অঙ্গ তিনবার ধৌত করেছেন, কোন অঙ্গ দুবার করে ধৌত করেছেন। আল হামদুলিল্লাহ বিষয়টি কঠিন নয়; বরং সহজ।

ওয়াজিব হচ্ছে প্রত্যেক অঙ্গ সর্বনিম্ন একবার ধৌত করে সর্বস্থানে পানি পৌঁছে দেয়া। মুখমণ্ডলকে ধৌত করার সময় কুলি করবে ও নাক ঝাড়বে। হাতে এমনভাবে পানি পৌঁছাবে যাতে কনুইসহ ধৌত করা সম্ভব হয়। একই নিয়মে বাম হাতেও পানি পৌঁছাবে। মাথা এবং কান মাসেহ করার সময় সম্পূর্ণটাই মাসেহ করবে। অতঃপর একবার পায়ে পানি ঢেলে টাখনুসহ সম্পূর্ণ অংশ

ধৌত করবে। প্রথমে ডান পা, পরে বাম পা। এতটুকু হচ্ছে ওয়াজিব। কিন্তু এরূপ পানি ঢালা যদি দুবার করে আরো উত্তম। যদি তিনবার করে তবে আরো উত্তম। আর এ নিয়মে ওযু সম্পন্ন হবে।

ওযু শেষ করে দুয়া পাঠ করবেঃ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাহাবীদের যে দুয়া শিক্ষা দিয়েছেন তা সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ »

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে ওযু করবে তারপর পাঠ করবে, আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মা বুদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। তবে তার জন্য বেহেস্তের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[1] এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম। ইমাম তিরমিযী এই কথাটিও সেই সাথে বর্ণনা করেছেন:

اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ তাহারাত বা পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ ওযুর শেষে দুয়া। হা/২৩৪ উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে উক্বা বিন আমের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন।

“হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের শামিল কর।”[1]

যদি টয়লেটের মধ্যে ওযু করে তবে এই দুয়াগুলো বাইরে এসে পাঠ করবে।

এই আলোচনার মাধ্যমে ওযুর শরঈ পদ্ধতি জানা গেল। ওযু হচ্ছে সালাতের চাবি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন,

« مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ »

সালাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা। সালাত শুরু হয় তাকবীরের মাধ্যমে এবং শেষ হয় সালামের মাধ্যমে।[2]

---

[1]. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ তাহারাত বা পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ ওযুর সময় কি বলতে হয়। হা/৫৫ ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

[2]. তিরমিযী, অধ্যায়ঃ তাহারাত বা পবিত্রতা,অনুচ্ছেদঃ পবিত্রতা সালাতের চাবি। হা/৩ আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

আযানের সময় ও আযানের পর কি দুয়া ও যিকির পাঠ করতে হয়ঃ

১) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, « إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» "যখন তোমরা মুআযযিনের আযান শুনবে তখন জবাবে আযানের শব্দগুলো অনুরূপভাবে মুখে উচ্চরণ করবে। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)[1]

২) জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে আযান শুনে এই দুআ পাঠ করবে:

اللهم رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَ الفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقامًا مَحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَهُ

অর্থঃ হে আল্লাহ্ এই পরিপূর্ণ আহবান এবং এই প্রতিষ্ঠিত নামাযের তুমিই প্রভূ। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে দান কর সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান এবং সুমহান মর্যাদা। তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর প্রশংসিত স্থানে যার অঙ্গিকার তুমি তাঁকে দিয়েছো।[2]

তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে। (বুখারী) হাসান সনদে ইমাম বাইহাকীর বর্ণনায় এই দুয়ার

---

1 . বুখারী,অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ আযান শুনলে কি বলতে হয়। হা/৬১১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মুয়াযযিন আযানে যা বলে শ্রবণকারীর তাই বলা মুস্তাহাব, হা/৩৮৩।

2 . বুখারী,অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ আযানের সময় দুয়া। হা/৬১৪।

শেষে এই কথাটুকুও বর্ণিত আছেঃ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ নিশ্চয় আপনি অঙ্গিকার ভঙ্গ করেন না।[1]

৩) সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে এই দুয়াটি পাঠ করবে,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِالله رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا،

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে প্রতিপালক,ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছি। তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (মুসলিম)[2]

৪) ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেন,

« إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ الله. قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى

---

1 . বাইহাকী সুনানে কুবরা। ১/৪১০ হা/১৭৯০।

2 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মুয়াযযিন আযানে যা বলে শ্রবণকারীর তাই বলা মুস্তাহাব, হা/৩৮৬।

الفَلاَحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله. قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ »

মুয়াযযিন যখন বলে, আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার, তখন তোমাদের কেউ যদি বলে, আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার। সে যখন বলে, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, তখন বলে, আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, যখন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসুলুল্লাহ, তখন বলে,আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসুলুল্লাহ। যখন বলে, হাইয়্যা আলাসসালাহ, তখন বলে, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যখন বলে, হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ, তখন বলে, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যখন বলে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, তখন বলে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। যখন বলে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, তখন অন্তর থেকে বলে, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[1]

৫) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে একথা বলতে শুনেছেন,

« إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّواعَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا الله لِي الوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত,অনুচ্ছেদঃ মুয়াযযিন আযানে যা বলে শ্রবণকারীর তাই বলা মুস্তাহাব, হা/৩৮৫।

أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ »

‘যখন তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনবে তখন জবাবে আযানের শব্দগুলো অনুরূপভাবে মুখে উচ্চরণ করবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করবেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলার প্রার্থনা কর। ওসীলা জান্নাতের একটি স্তরের নাম যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে শুধু একজনের জন্যই উপযুক্ত। আশা করি আমিই সে ব্যক্তি। যে লোক আমার জন্য ওসীলার প্রার্থনা করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত আবশ্যক হয়ে যাবে। (মুসলিম)[1]

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত,অনুচ্ছেদঃ মুয়াযযিন আযানে যা বলে শ্রবণকারীর তাই বলা মুস্তাহাব, হা/৩৮৪।

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যা বলতে হয়ঃ

১) আবু হুমাইদ অথবা আবু উসাইদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন এই দুয়া বলে, اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। আর যখন বের হবে তখন যেন এই দুয়া পাঠ করে, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার অনুগ্রহ প্রর্থনা করছি।' (মুসলিম, আবু দাউদ। এ বর্ণনাটি আবু দাউদের)[1]

২) আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন বলতেন, «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» 'মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত সত্বা এবং চিরস্থায়ী রাজত্বের উসিলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' তিনি বলেন, কেউ এই দুয়া পাঠ করলে শয়তান বলে, সারা দিন এ ব্যক্তি আমার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেল। (আবু দাউদ, সনদ হাসান)[2]

---

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সালাত ও কসর, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশ করার দুয়া, হা/৭১৩। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশের সময় যা বলতে হয় ।৪৬৫ /হা ,

2 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত,অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশের সময় যা বলতে হয়, হা/ ৪৬৬।

৩) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর উপর সালাম পেশ করে এবং এই দুয়াটি বলে, اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও। আর যখন বের হবে তখন যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর উপর সালাম পেশ করে এবং এই দুয়াটি বলে, اللَّهُمَّ: اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ 'হে আল্লাহ! বিতাড়িত শয়তান থেকে আমাকে নিরাপদ রাখ।' (ইবনে মাজাহ, সনদ সহীহ।)[1]

❁❁❁

[1] . ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও জামাআত, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে প্রবেশের সময় দুয়া হা/৭৭৩।

صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর সালাতের পদ্ধতিঃ [1]

সকল প্রশংসা একককভাবে আল্লাহর জন্য নিবেদিত। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করার বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। মুসলিম পুরুষ ও নারীদের জন্য আমি তা পেশ করছি, যাতে করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর অনুসরণ করে তাদের সালাতকে আদায় করতে সচেষ্ট হয়। কেননা তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছো।[2] (বুখারী)

তাই সম্মানিত পাঠকদের সামনে নিম্নে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলঃ

১) পরিপূর্ণ রূপে ওযু করবে। অর্থাৎ আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন, সেভাবে ওযু করবে। যেমনটি তিনি এরশাদ করেছেন,

---

[1] . মাজমু ফাতাওয়া শাইখ বিন বায। ১১/১-১৭।

[2] .বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ মুসাফিরের আযান হা/৬৩১। মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের ইচ্ছা কর,তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দুটি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো,তোমাদের মাথা মাসেহ কর এবং পা দুটি টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর। (মায়েদাঃ ৬)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» পবিত্রতা ব্যতীত কোন সালাত কবুল হবে না।[1]

জনৈক সাহাবী ভুল পদ্ধতিতে সালাত আদায় করছিল, তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাকে সালাতের বিশুদ্ধ পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ» যখন সালাত আদায় করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন পরিপূর্ণরূপে ওযু করবে।[2]

২) মুসল্লী কিবলামুখী হবে। কিবলা হচ্ছে মক্কায় অবস্থিত কাবা শরীফ। মুসল্লী যেখানেই থাক ফরয বা নফল যে সালাতেরই ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করুক, সমস্ত শরীর নিয়ে কিবলামুখী হবে।

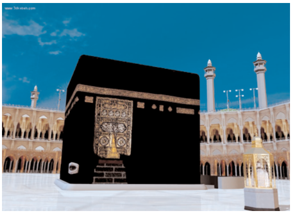

[1] মুসলিম, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুচ্ছেদঃ সালাতের জন্য তাহারাত আবশ্যক। হা/২২৪।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমাম মুক্তাদী উভয়ের জন্য ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। হা/৭৫৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ প্রত্যেক রাকাতে ফাতিহা পড়া আবশ্যক। হা/৩৯৭।

নিয়ত মুখে উচ্চারণ করবে না। কেননা মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা শরীয়ত সম্মত নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বা তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কেউ নিয়ত মুখে উচ্চারণ করেননি।

মুসল্লী যদি ইমাম বা একাকী সালাত আদায়কারী হয় তবে তার সম্মুখে একটি সুতরা রাখবে। (নামাযীর সম্মুখে সর্বনিম্ন অর্ধহাত পরিমাণ উঁচু বস্তু রাখাকে সুতরা বলে।)

সালাতের অন্যতম শর্ত হচ্ছে কিবলামুখী হওয়া। এ শর্তের শিথীলতা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আছে। তবে তার বিস্তারিত বিবরণ উলামাদের বই-পুস্তকে আছে।

৩) তাকবীরে তাহরীমা বলবে। সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে সালাত শুরু করার জন্য বলবে, আল্লাহ আকবার।

৪) তাকবীর বলার সময় হাত দুটো দুকাঁধ অথবা দুকান বরাবর উত্তোলন করবে।

৫) ডান হাতকে বাম হাতের কব্জির উপর রেখে উভয় হাতকে বুকের উপর ধারণ করবে। কেননা হাত বাঁধার বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে এভাবেই প্রমাণিত হয়েছে।

৬) হাত বাঁধার পর প্রথম সুন্নাত হচ্ছে ছানা পাঠ করা। নিম্ন লিখত যে কোন একটি দুয়া ছানা হিসেবে পাঠ করতে পারেঃ

« اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي من خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ »

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা বাএদ বাইনী ওয়া বায়না খাতাইয়ায়া, কামা বাআদতা বায়নাল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে। আল্লাহুম্মা নাক্কেনী মিনাল খাতায়া, কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ দানাসী। আল্লাহুম্মাগ সিলনী মিন খাতাইয়ায়া বিল মাই ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারদি।

অর্থঃ হে আল্লাহ আমার মাঝে এবং আমার গুনাহের মাঝে এমন দূরত্ব দিয়ে দাও যেমন দূরত্ব আছে পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে। হে আল্লাহ আমাকে গুনাহ থেকে পরিস্কার করে দাও, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। হে আল্লাহ আমার গুনাহগুলো পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে দাও।[1]

অথবা এই দুয়াটি পড়বেঃ

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ »

সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবি হামদিকা ওয়া তাবারাকুসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

হে আল্লাহ তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতময়, তুমি সম্মানিত সুউচ্চ। তুমি ব্যতীত

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ তাকবীর দেয়ার পর কি বলবে হা/৭৪৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ, অনুচ্ছেদঃ তাকবীর তাহরিমযা দেয়ার পর কি বলবে হা/৭৪৪। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

কোন উপাস্য নেই।[1]

এছাড়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে ছানা হিসেবে প্রমাণিত অন্য কোন দুয়া যদি পাঠ করে, তবু কোন অসুবিধা নেই। তবে উত্তম হচ্ছে কখনো এটা পাঠ করবে, কখনো ওটা পাঠ করবে। তাহলে হাদীছের অনুসরণ সকল দিক থেকে হবে। তারপর বলবে, আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এরপর পাঠ করবে সুরাতুল ফাতিহা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, » لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ « যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়বে না তার সালাত হবে না।[2] ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলবে। সালাত উচ্চকণ্ঠের হলে স্বজোরে আমীন বলবে, নীচু কণ্ঠের হলে নীরবে আমীন বলবে। তারপর কুরআনে যে কোন স্থান থেকে সহজ কোন অংশ তেলাওয়াত করবে।

৭) তাকবীর দিয়ে রুকূ করবে। এ সময় রফউল ইয়াদাইন করবে,তথা দুহাতকে দুকাঁধ অথবা দুকান পর্যন্ত উত্তোলন করবে। রুকূর সময় মাথা ও পিঠ বরাবর রাখবে। হাতের

[1] . এই বর্ণনাটি মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আবু সাঈদ খুদরী ও আয়েশা (রাঃ) থেকে। আবু দাউদঃ অধ্যায়ঃ সালাত,অনুচ্ছেদঃ ছানা পড়ার বিবরণ হা/৭৭৫,৭৭৬। হাদীছটি মাওকূফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ওমার বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ বিসমিল্লাহ জোরে না বলার পক্ষে মতপোষণকারীদের দলীল। হা/৩৯৯।

[2]. বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্য ফাতিহা পড়া আবশ্যক। হা/৭৫৬। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, হাঅনুচ্ছেদঃ প্রতি রাকাতে ফাতি পড়া ওয়াজিব, হা/৩৯৪। উবাদা বিন সামেত রাঃ থেকে বর্ণিত।

আঙ্গুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে তা দ্বারা দু'হাঁটুকে আকঁড়ে ধরবে।

রুকূতে ধীরস্থীরতা অবলম্বন করবে। পাঠ করবে, سبحان ربي العظيم সুবহানা রাব্বিয়্যাল আযীম। উত্তম হচ্ছে তিন বা ততোধিকবার পাঠ করবে। সেই সাথে এ দুয়াটি বলাও মুস্তাহাব: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী।

৮) তাকবীর দিয়ে রুকু থেকে মাথা উঠাবে। এ সময় রফউল ইয়াদাইন করবে, তথা দুহাতকে দুকাঁধ অথবা দুকান পর্যন্ত উত্তোলন করবে। মুসল্লী যদি ইমাম হয় বা একাকী হয় তবে পাঠ করবে সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ।

আর দাঁড়ানো অবস্থায় বলবে,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। হামদান কাছীরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফীহ।

مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

মিল আস সামাওয়াতি ওয়া মিল আল আরযী ওয়া মিলআ মা বায়নাহুমা, ওয়া মিলআ মা শিতা মিন শাইয়িন বা'দু।

কিন্তু মুক্তাদী হলে শুধু রাব্বানা লাকাল হামদু... থেকে শেষ পর্যন্ত বলবে। ইমাম মুক্তাদী সকলের জন্যে মুস্তাহাব হচ্ছে রুকুর পর দুহাতকে বুকের উপর ধারণ করা। কেননা ওয়ায়েল বিন হুজুর এবং সাহল বিন সা দ (রাঃ)বর্ণিত হাদীছ দুটোর বক্তব্য থেকে একথাই

প্রমাণিত হয় যে,নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) রুকুর পর এরূপ করেছেন।[1]

৯) তাকবীর দিয়ে সিজদা করবে। এ সময় দুহাত রাখার পূর্বে দুহাঁটু রাখবে। যদি কষ্ট হয় তবে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখতে পারে। সিজদা অবস্থায় দুপা ও দুহাতের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখবে,হাতের আঙ্গুলগুলোকে একত্রিত করে রাখবে। সিজদা হবে সাতটি অঙ্গের উপর।

নাকসহ কপাল, দুহাত, দু হাঁটু,দু পায়ের আঙ্গুল সমূহের নিম্নভাগ।

এসময় পাঠ করবে: সুবহানা রাব্বীয়াল আ লা। এ তাসবীহ তিন বা ততোধিকবার বলবে। সেই সাথে এ দুয়াটি বলাও মুস্তাহাব: সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী। সিজদা অবস্থায় বেশী বেশী দুয়া করতে সচেষ্ট থাকবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»

রুকুতে পালনকর্তার মহত্ব বর্ণনা করবে, কিন্তু সিজদায় দুয়া করতে চেষ্টা করবে। কেননা এ অবস্থার কবুল হওয়ার উপযুক্ত।[2]

---

[1]. ওয়ায়েল বিন হুজরের হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইমাম মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ তাকবীরে তাহরিমার পর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা। হা/৪০১। সাহল বিন সাদ (রাঃ)এর হাদীছ বর্ণনা করেছেন বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদঃ ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা। হা/৭৪০।

[2]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ রুকু-সিজদায় কুরআন পড়া নিষেধ হা/৪৭৯। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

তাই নামায ফরয হোক বা নফল সিজদায় গিয়ে পালনকর্তা আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করবে। সিজদা অবস্থায় দুবাহুকে দু পার্শদেশ থেকে দূরে রাখবে, পেটকে দুরান থেকে দূরে রাখবে, উভয় রানকে উভয় পায়ের নলা থেকে আলাদা রাখবে। আর হাত দুটো যমীন থেকে উঠিয়ে রাখবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)বলেন, « اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ » তোমরা সঠিকভাবে সিজদা কর। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত হাতের নলা মাটিতে বিছিয়ে না দেয়।[1]

১০)তাকবীর দিয়ে সিজদা থেকে মাথা উঠাবে। বাম পা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে। আর হাতদুটো দুউরু ও দুহাঁটুর উপর রাখবে।

এসময় পাঠ করবে,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وعَافِنِيْ وَاجْبُرْنِي

রাব্বেগফেরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াহদেনী, ওয়ারযুক্বনী ওয়া আফেনী, ওয়াজবুরনী। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন, হেদায়াত করুন, রিযিক দান করুন,নিরাপত্তা দান করুন ও ঘাটতি পুরন করুন।

সিজদা থেকে উঠে স্থীর হয়ে বসবে।

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাতের সময়,অনুচ্ছেদঃ মুসল্লী তার পালনকর্তার সাথে গোপনে কথা বলে, হা/৫৩২। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ সিজদায় ধীরস্থীরতা অবলম্বন করা। হা/৪৯৩। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

১১) এরপর তাকবীর দিয়ে দ্বিতীয় সিজদা করবে। প্রথম সিজদায় যা করেছে এ সিজদাতেও তা করবে।

১২) দ্বিতীয় সিজদা থেকে তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে, তারপর হালকা একটু বসবে, এটাকে জালসা ইসতেরাহা বা আরামের বসা বলা হয়। এরূপ করা মুস্তাহাব। যদি না করে কোন অসুবিধা নেই। এই বসায় কোন দুয়া বা যিকির নেই। এরপর দুহাঁটুর উপর ভর রেখে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু উঠার সময় দুহাঁটুর উপর ভর রাখতে কষ্ট হলে, দুহাতের উপর ভর করে দাঁড়াবে। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং তারপর কুরআনের সহজ কোন অংশ যেমন একটি সূরা বা কিছু আয়াত পাঠ করবে। অতঃপর প্রথম রাকাতে যা করেছিল এখানেও তা করবে।

১৩) নামায যদি দুরাকাত হয়, যেমন ফজর, জুমআ, ঈদ ইত্যাদি তবে দ্বিতীয় রাকাতের দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বসে যাবে। ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসবে।

ডান হাতকে ডান উরুর উপর রাখবে এবং সবগুলো আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করবে, কিন্তু শুধু তর্জনী আঙ্গুল খাড়া রেখে তা দ্বারা তাওহীদের ইশারা করবে। কিন্তু যদি কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করে বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে মধ্যমার সাথে বৃত্তের মত বানিয়ে এবং তর্জনী খাড়া রেখে তা দ্বারা ইশারা করে, তবে সেটাও উত্তম। উভয় পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)থেকে সহীহ

সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। তবে উত্তম হচ্ছে কখনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা কখনো অন্যটি। আর বাম হাতকে বাম উরু ও হাঁটুর উপর রাখবে। এই বৈঠকে তাশাহুদ পড়বে।

« التَّحِيَّاتُ لِله، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ »

আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্ তাইয়্যেবাতু আস্ সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্ সালামু আলাইনা ওয়া আলা ঈবাদিল্লাস্ সালেহীন। আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

অর্থঃ সব রকম মৌখিক,শারীরিক ও আর্থিক এবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ কর্মশীল বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।[1]

তারপর নিম্নের দরূদ শরীফ পাঠ করবে:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ،

---

[1]. বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাত,অনুচ্ছেদঃ শেষ তাশাহুদের দুয়া হা/৮৩১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ সালাতের তাশাহুদ হা/৪০২। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ্ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐরূপ রহমত নাযিল কর যেরূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।[1]

অতঃপর চারটি অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে এই দুয়াটি পাঠ করার মাধ্যমেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি ওয়ামিন আযাবিন্ নার, ওয়ামিন ফিতনাতিল মাহয়া ওয়াল্ মামাতি,

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাতের সময়,অনুচ্ছেদঃ নং ১০ হা/৩৩৭৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ নবী (সাঃ)এর প্রতি দরূদ। হা/৪০২। কাব বিন উজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

ওয়ামিন ফিতনাতিল্ মাসীহিদ্দাজ্জাল। অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের শাস্তি হতে, জাহান্নামের শাস্তি হতে, জীবনের ও মরণ কালীন ফিতনা (কঠিন পরীক্ষা) হতে এবং দাজ্জালের ফিতনা (অনিষ্ট) হতে।" (বুখারী)

এরপর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ কামনা করে যে কোন দুয়া পাঠ করবে। যদি পিতা-মাতার জন্য বা অন্যান্য মুসলিমদের জন্য দুয়া করে, তবে কোন অসুবিধা নেই। নামায ফরয হোক বা সুন্নাত বা নফল সর্বাবস্থায় দুয়া করতে পারে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর হাদীছ এ ব্যাপারে ব্যাপক অর্থবোধক। ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাশাহুদ শিক্ষা দেয়ার পর বলেছেন, এরপর তোমার নিকট পছন্দ হয় এরকম যে কোন দুয়া নির্বাচন করবে, এবং তা দ্বারা দুয়া করবে।[1]

অন্য বর্ণনায় আছে, এরপর যা ইচ্ছা তা চাইবে।[2] এটা দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণকে শামিল করে।

তারপর ডানে ও বামে সালাম দিবে। বলবে, আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

১৪) সালাত যদি তিন রাকাত বিশিষ্ট হয়,

[1] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদ তাশাহুদ, হা/৯৬৮।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ সালাতের তাশাহহুদ হা/৪০২। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

যেমন মাগরিব। অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট হয়, যেমন যোহর, আসর ও ইশা, তবে উক্ত তাশাহুদ এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দু হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবে।

এ সময় হাত দুটোকে কাঁধ বরাবর উত্তোলন (রফউল ইয়াদাইন) করবে। বলবে আল্লাহু আকবার। পূর্বের নিয়মে দুহাত বুকের উপর ধারণ করে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তবে এই তৃতীয় রাকাতে ও চতুর্থ রাকাতে যদি কখনো কখনো ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করে, তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর হাদীছ থেকে একথার দলীল পাওয়া যায়।[1]

প্রথম তাশাহুদে যদি দরূদ না পড়ে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা প্রথম তাশাহুদে দরূদ পড়া মুস্তাহাব; ওয়াজিব নয়।

এরপর মাগরিবের তৃতীয় রাকাত এবং যোহর, আসর ও ইশার চতুর্থ রাকাত শেষে তাশাহুদের জন্য তাওয়াররুক করে বসবে। [অর্থাৎ- বাম পাকে ডান পায়ের নীচে দিয়ে নিয়ে বের করে দিবে, ডান পা খাড়া রাখবে এবং সম্পূর্ণ নিতম্ব মাটিতে রেখে বসবে। পূর্ব পৃষ্ঠার ছবি দ্রষ্টব্য] এবার পূর্ব বর্ণিত তাশাহুদ ও দুয়া সম্পূর্ণ পাঠ করবে এবং সবশেষে ডানে ও বামে সালাম ফেরাবে।

---

1 . দেখুন সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ যোহর ও আসর সালাতে কিরাত। হা/৪৫১।

ফরয সালাতের পর দুয়া ও যিকিরঃ

প্রথমতঃ তিনবার পাঠ করবে আস্তাগফিরুল্লাহ। তারপর এই দুয়াগুলো পাঠ করবেঃ

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ»

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালে ওয়াল ইকরাম।[1]

«لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ»

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।

আল্লাহুম্মা লা-মা-নেআ লেমা আত্বায়তা ওয়ালা মু'তিয়া লেমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থঃ 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব, তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

'হে আল্লাহ! আপনি যা দান করেন তা রোধকারী কেউ নেই। এবং আপনি যা রোধ করেন তা দানকারী কেউ নেই। আর কোন মর্যাদাবানের মর্যাদা আপনার নিকট থেকে কোন উপকার আদায় করে দিতে পারে না।'[2]

---

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ সালাতের পর যিকির করা মুস্তাহাব। হা/৫৯১, ৫৯২। ছাওবান ও আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

[2]. বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাতের পদ্ধতি,অনুচ্ছেদঃ ইমামের সালামের জবাবে নামাযের

«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ»

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ,লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন্নিয়মাতু ওয়ালাহুল ফাযলু ওয়ালাহুছ ছানাউল্ হাসানু, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারেহাল কাফেরূন।

অর্থঃ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করি না। একমাত্র তাঁর অধিকারে সমস্ত নেয়ামত, তাঁরই জন্য সমস্ত সম্মান মর্যাদা,আর তাঁরই জন্য উত্তম স্তুতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। তার নিমিত্তে আমরা দ্বীন পালন করি একনিষ্ঠভাবে। যদিও কাফেররা তা মন্দ ভাবে।'[1]

তারপর 'সুবহানাল্লাহ' বলবে ৩৩ বার, 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' বলবে ৩৩ বার এবং একশত পূর্ণ করার জন্য বলবে:

لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

সালাম, হা/৮০৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ সালাতের পর যিকির করা মুস্তাহাব। হা/৫৯৩, মুগীরা বিন শোবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

[1]. মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ সালাতের পর যিকির করা মুস্তাহাব। হা/৫৯৪। আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু,ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।[1]

এরপর আয়াতুল কুরসী (সূরা বাক্বারা ২৫৫ নং আয়াত) পাঠ করবে।

প্রত্যেক নামাযের পর একবার করে পাঠ করবে: সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। তবে ফজর ও মাগরিব নামাযের পর সূরাগুলো তিনবার করে পাঠ করবে।[2]

ফজর ও মাগরিব সালাতের পর উল্লেখিত দুয়া-যিকিরগুলো পাঠ করে এই দুয়াটি দশবার পাঠ করবে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু,ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।

যিনি ইমাম তার জন্যে সুন্নাত হচ্ছে সালাম ফেরানোর পর তিনবার আস্তাগফিরুল্লাহ এবং আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম... বলে মুসল্লীদের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসবে। তারপর উপরে উল্লেখিত যিকির সমূহ পাঠ করবে। যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে অনেকগুলো হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ, সহীহ মুসলিম।[3]

সালাতের পর এই দুয়া ও যিকিরগুলো পাঠ করা সুন্নাত; ফরয নয়।

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ সালাতের পর যিকির করা মুস্তাহাব। হা/৫৯৫। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

[2] . হাদীছটি আবদুল্লাহ বিন হাবীব থেকে বর্ণিত। হাদীছটির রেফারেন্স সকাল-সন্ধ্যার যিকির সম্পর্কে আলোচনা করার সময় উল্লেখ করা হবে।

[3] . এই আলোচনাটি নেয়া হয়েছে তোহফাতুল ইখওয়ান কিতাব থেকে। পৃষ্ঠা নং ১৩। আরো আছে মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১১/১৮৮, ২৬/২৪

সুন্নাত-নফল নামাযের বিবরণঃ

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত নামাযগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয়া। যোহরের পূর্বে চার রাকাত, পরে দু রাকাত, মাগরিবের পর দু রাকাত, ইশার পর দু রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দু রাকাত। মোট ১২ (বার) রাকাত। এগুলোকে বলা হয় সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মুকীম অবস্থায় এগুলো সর্বদা আদায় করতেন। কিন্তু সফরে গেলে ফজরের দু রাকাত সুন্নাত ও বিতর ব্যতীত অন্যান্য সুন্নাত বাদ দিতেন। এই দু নামায (ফজরের দু রাকাত সুন্নাত ও বিতর) তিনি মুকীম ও সফর সর্বাবস্থায় যত্নের সাথে আদায় করতেন।

যাবতীয় সুন্নাত ও বিতর নামায বাড়ীতে আদায় করা উত্তম। অবশ্য মসজিদে আদায় করলেও কোন অসুবিধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, « أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ফরয নামায ব্যতীত মানুষের সেই নামায বেশী উত্তম যা গৃহে আদায় করা হয়। [1]

এই নামাযগুলো নিয়োমিত আদায় করা জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ تَطَوُّعًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» যে ব্যক্তি রাত-দিনে বার রাকাত নফল নামায আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান,অনুচ্ছেদঃ রাতের সালাত হা/৭৩১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সালাত ও তা কসরের বিবরণ, অনুচ্ছেদঃ নফল নামায ঘরে আদায় করা মুস্তাহাব। হা/৭২১, যায়দ বিন ছাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।[1]

এ ছাড়া যদি আসরের পূর্বে চার রাকাত,মাগরিবের পূর্বে দু রাকাত ও ইশার পূর্বে দু রাকাত আদায় করে,তবে তা উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছগুলোতে একথা প্রমাণিত। যদি যোহরের পর চার রাকাত এবং পূর্বে চার রাকাত পড়ে তবে তা বেশী উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ» যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাত নিয়োমিত আদায় করতে যত্নবান হবে, তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করা হবে।[2]

অর্থাৎ যোহরের পর নিয়োমিত দু রাকাতের উপর আরো অতিরিক্ত দু রাকাত আদায় করতেন। কেননা নিয়মিত সুন্নাত হচ্ছে যোহরের পূর্বে চার রাকাত পরে দু রাকাত। এখন পরে যদি আরো দু রাকাত বেশী পড়ে, তবে উম্মে হাবীবা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যে ফযীলত বর্ণিত হয়েছে তা হাসিল করবে। আল্লাহই সকল তাওফীক দাতা।

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি।

---

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সালাত ও তা কসরের বিবরণ, অনুচ্ছেদঃ নিয়োমিত সুন্নাত নামাযের ফযীলত। হা/৭২৮, উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

2 . আহমাদ ৬/২৩৬। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত অনুচ্ছেদঃ যোহরের পূর্বে ও পরে চার রাকাত। হা/১২৬৯। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ নং ২০৫, হা/৪২৭। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃকিয়ামুল্লায়ল ও দিনের নফল নামায, হা/১৮১৫। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ সালাত কায়েম করা ও তার সুন্নাত, অনুচ্ছেদঃ যোহরের পূর্বে চার রাকাত ও পরে চার রাকাতের আলোচনা, হা/১১৬০। উম্ম হাবীবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

صفة صلاة الجنازة

জানাযা সালাতের পদ্ধতি[1]

প্রশ্নঃ জনৈক ব্যক্তি এক সাথে পাঁচ জন মৃত ব্যক্তির উপর একটি মাত্র জানাযা নামায আদায় করেছে। এ ব্যক্তি কি প্রতিটি মৃত ব্যক্তির বিনিময়ে একটি করে ক্বীরাতের ছোয়াব পাবে? না প্রতিটি জানাযা সালাতের বিনিময়ে উক্ত কীরাত পাওয়া যাবে?

উত্তরঃ প্রতিটি মৃত ব্যক্তির বিনিময়ে একটি করে ক্বীরাত ছোয়াব লাভের আশা করছি। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»

যে ব্যক্তি জানাযার সালাত আদায় করবে কিন্তু মৃতের সাথে কবরস্থানে যাবে না, সে এক ক্বীরাত ছোয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে এবং দাফন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, সে দু ক্বীরাত ছোয়াব পাবে।[2]

এ অর্থ বোধক অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সবগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, মৃত ব্যক্তির সংখ্যা অনুসারে ক্বীরাত লাভ করা যাবে। যে ব্যক্তি একজন মৃতের উপর জানাযা নামায পড়বে, সে এক ক্বীরাত

---

1 . সম্মানিত শাইখের একটি ফতোয়া, আদ দাওয়া ম্যাগাজিনে প্রকাশিত। সংখ্যা ১৬৬০, ৪ জুমাদাল উখরা ১৪১৯ হিজরী। দ্রঃ মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ, ১৩/১৩৬-১৩৭।

2 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ জানাযা নামাযের ফযীলত। হা/৯৪৬, আবু হুরাইরা (রাঃ)থেকে বর্ণিত।

ছোয়াব পাবে। আর যে শুধু লাশের অনুসরণ করে গোরস্থানে যায় এবং দাফন পর্যন্ত সেখানে থাকে, সে একটি ক্বীরাত পাবে। আর যে ব্যক্তি জানাযা নামায পড়বে এবং কবরস্থানে গিয়ে দাফন হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে সে দুক্বীরাত ছোয়াব পাবে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। নিশ্চয় তিনি মহান দাতা ও বান্দাদের উপর করুণাকারী। সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁরই। তিনি ব্যতীত সত্য উপাস্য ও পালনকর্তা কেউ নেই। আল্লাহই সকল তাওফীক দাতা।

প্রশ্নঃ জানাযা সালাতের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে কিরূপ? এর জন্য কি পবিত্রতা আবশ্যক?[1]

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির উপর জানাযা সালাতের ক্ষেত্রে অবশ্যই পবিত্রতা দরকার। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে সালাত হিসেবে নামকরণ করেছেন। এটা এমন সালাত যা শুরু করার নিয়ম আছে, তাতে আছে তাকবীর ও সালাম। অতএব পবিত্রতা সহকারে এ সালাত আদায় করা আবশ্যক। ওয়াজিব হচ্ছে ফাতিহা পাঠ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ ও মৃতের জন্য দুয়া পাঠ করা। অতএব এটা নামায। পবিত্রতা ব্যতীত কেউ এ সালাত আদায় করলে বিশুদ্ধ হবে না।

জানাযার বিস্তারিত নিয়মঃ

১) প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলবে, তারপর সূরা ফাতিহা ও তার সাথে ছোট একটি সূরা বা সহজ কোন আয়াত পাঠ করবে।

[1] . দেখুনঃ ইসলামী ফাতাওয়া ২/২৬, সংকলনঃ মুহাম্মাদ আল মুসনেদ। আরো দেখুন, মাজমু ফাতাওয়া ও বিভিন্ন প্রবন্ধ ১৩/ ১৪১ ও ৩/২৯৬।

২) দ্বিতীয়বার তাকবীর দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ পড়বে। দরূদে ইবরাহীমঃ

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ্ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাক্তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐরূপ রহমত নাযিল কর যেরূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।[1]

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাতের সময়,অনুচ্ছেদঃ নং ১০ হা/৩৩৭৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ

৩) তৃতীয় তাকবীর দিয়ে মৃতের জন্য দুয়া পাঠ করবে:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيــمَانِ، وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ »

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিত ও মৃত,ছোট ও বড়, নর ও নারী, উপস্থিত ও অনুপস্থিতকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ্! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ঈমানের উপর জীবিত রাখ। এবং যাদের মৃত্যু দান কর তাদেরকে ইসলামের সাথে মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে তার ছোয়াব হতে বঞ্চিত কর না এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট কর না।[1]

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا، كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ»

«وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ».

'হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা কর,তার প্রতি দয়া কর, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখ। তাকে মাফ করে দাও। তার আতিথেয়তা

সালাত, অনুচ্ছেদঃ নবী (সাঃ)এর প্রতি দরূদ। হা/৪০২। কাব বিন উজরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

[1] . মুসনাদে আহমাদ, ২/৩৬৮। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ জানাযা,অনুচ্ছেদঃ মৃতের জন্য দুয়া। হা/৩২০১। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ জানাযা,অনুচ্ছেদঃ জানাযায় পাঠ করার দুয়া। হা/১৪৯৮।

সম্মানজনক কর। তার বাসস্থানকে প্রশস্ত করে দাও। তুমি তাকে ধৌত কর পানি, বরফ ও শিশির দিয়ে। তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিস্কার কর যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। দুনিয়ার ঘরের পরিবর্তে তাকে উত্তম ঘর দান কর। দুনিয়ার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান কর। আরো দান কর দুনিয়ার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী। তাকে বেহেস্তে দাখিল কর। আর কবরের আযাব ও জাহান্নামের আযাব থেকে তাকে পরিত্রাণ দিন।[1]

তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং আলোকিত করে দাও।[2]

৪) চতুর্থ তাকবীর দিবে, তারপর সামান্য একটু দেরী করেই ডান দিকে একবার সালাম ফেরাবে।

প্রতিটি তাকবীর বলার সময় দুহাত উত্তোলন করা মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তি মহিলা হলে বলবে, আল্লাহুম্মাগ ফির লাহা...। জানাযা যদি দুজন মৃতের উপর হয় তখন বলবে, আল্লাহুম্মাগ ফির লাহুমা...। আর দুয়ের অধিক হলে বলবে আল্লাহুম্মাগ ফির লাহুম...। জানাযা শিশুর হলে তার জন্য মাগফিরাতের দুয়া না করে এই দুয়াটি পাঠ করবে:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرطًا وَذُخرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّل بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ المُؤْمِنِينَ ، وَاجْعَلْهُ

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা,অনুচ্ছেদঃ মৃতের জন্য জানাযায় দুয়া। হা/৯৬৩। আওফ বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা,অনুচ্ছেদঃ মৃতের চোখ বন্ধ করে দেয়া তার জন্য দুয়া। হা/৯২০। আবু সালামার মৃত্যুতে উম্মে সালাম (রাঃ)বর্ণিত হাদীছ। ঐ দুয়াতে আরো এই কথাগুলো ছিল, « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمة وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ » হে আল্লাহ আবু সালামাকে ক্ষমা কর, হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদাকে উচ্চ করে দাও, অবশিষ্টদের মধ্যে তার প্রতিনিধি বানিয়ে দাও। আর আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, হে সমস্ত জগতের পালনকর্তা।

فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيم عليه السَّلام، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجَحِيم»

হে আল্লাহ এ শিশুকে তার পিতা-মাতার জন্য অগ্রগামী করে দাও, করে দাও সঞ্চিত সম্পদ। আরো বানিয়ে দাও মাকবুল সুপারিশকারী। হে আল্লাহ তার দ্বারা পিতা-মাতার হিসাবের পাল্লাকে ভারী করে দাও, তাদের প্রতিদানকে বিশাল করে দাও এবং তাকে নেক মুমিনদের মধ্যে শামিল করে দাও। তাকে ইবরাহীম (আঃ)এর তত্বাবধানে রাখ এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা কর।[1]

সুন্নাত হচ্ছে ইমাম জানাযার সালাতে পুরুষের মাথা বরাবর আর মহিলার শরীরের মধ্যবর্তী স্থান বরাবর দাঁড়াবে। কেননা এভাবেই তা প্রমাণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে। বর্ণনা করেছেন আনাস ও সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ)।

কিন্তু কোন কোন বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন যে, পুরুষের বুক বরাবর দাঁড়ানো সুন্নাত। এটা দুর্বল মত। আমাদের জানা মতে এর পক্ষে কোন দলীল নেই।

মৃতের জানাযা পড়ার সময় তার মুখ কিবলামুখী করে রাখতে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবা সম্পর্কে বলেছেন, কাবা তোমাদের কিবলা জীবিত অবস্থায় এবং মৃত অবস্থায়।[2]

জানাযা যদি একাধিক হয়, তবে পুরুষের লাশ ইমামের নিকটবর্তী দিকে রাখবে এবং তার পিছন দিকে তথা কিবলার দিকে

---

1 . এই দুয়াটির বিভিন্ন অংশ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফ গ্রন্থে। অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ জানাযায় কেরাত পাঠ ও মৃতের জন্য দুয়া। ৩/৪৯২ হা/৪৬৩৯।

2 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ ওসীয়ত,অনুচ্ছেদঃ ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত করলে কঠোর শাস্তি। হা/২৮৭৫। উবাইদ বিন উমাইর তাঁর পিতা থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন।

রাখবে নারীর লাশ। যদি শিশুদেরও লাশ থাকে, তবে ছেলে শিশুকে নারীর আগে রাখবে। তারপর রাখবে মহিলার লাশ, তারপর রাখবে মেয়ে শিশুর লাশ। ছেলে শিশুর মাথা থাকবে পুরুষের মাথা বরাবর। আর মহিলার শরীরের মধ্যবর্তী স্থান থাকবে পুরুষের মাথা বরাবর। অনুরূপভাবে মেয়ে শিশুর মাথা থাকবে মহিলার মাথা বরাবর। সমস্ত মুসল্লী ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি পিছনে দাঁড়ানোর জায়গা না পায়, তবে সে ইমামের ডান দিকে এসে দাঁড়াবে।

হজ, উমরা ও যিয়ারত
বহু বিষয়ের গবেষণা ও বিশ্লেষণ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক। আর শুভ পরিণতি মুক্তাক্বীদের জন্য নির্ধারিত। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদের উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সমস্ত সাহাবার উপর।

এই পুস্তিকাটিতে হজের ফযীলত, আদাব ও হজ পালনের উদ্দেশ্যে যারা সফরের ইচ্ছা পোষণ করেন তাদের জন্য হজ, উমরা ও যিয়ারত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে ও সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবেশিত হয়েছে। মুসলিম উম্মতের প্রতি মঙ্গল সাধনের ও মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনার্থে। হজ, উমরা ও যিয়ারতের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম-পদ্ধতি আমি পবিত্র কুরআন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের ভিত্তিতে সঠিক- ভাবে দলীল-প্রমাণসহ লিপিবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

অর্থঃ "সুতরাং তুমি নসীহত কর। কারণ, নসীহত মু মিনদের উপকারে আসে"। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৫)

কুরআন কারীমের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾

অর্থঃ “আর যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে তাদের নিকট থেকে আল্লাহ তায়ালা যখন এই অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তোমরা লোকদের নিকট তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করে রাখবেনা।” (সূরা আলে ইমরানঃ ১৮৭)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾

অর্থঃ “তোমরা নেক কাজে ও আল্লাহ-ভীতির পথে পরস্পর সহযোগিতা কর।” (সূরা মায়িদাঃ ২)

সহীহ হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ ثلاثاً قَالَ قِيلَ: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

অর্থঃ দ্বীন হচ্ছে উপদেশ-নসীহতের নাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একথা তিনবার বললেন। তাঁকে বলা হলোঃ কার জন্য উপদেশ-নসীহত, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেনঃ “আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের ইমাম-শাসকবৃন্দ ও মুসলিম জনসাধারণের জন্য।”

হুজায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেনঃ

«مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ ولإِمَامِهِ ولِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ»

যে ব্যক্তি মুসলমানদের ব্যাপারে মনযোগ প্রদান না করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল, মুসলমানদের ইমাম-শাসকবৃন্দ এবং সাধারণ মুসলমানদের নসীহতকারী না হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (তাবারানী)

আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এই পুস্তিকার দ্বারা আমাকে ও মুসলিম জনসাধারণকে উপকৃত করেন এবং এক্ষেত্রে যাবতীয় প্রচেষ্টা তাঁরই জন্য খালেস করে দেন। আরো দুয়া করি, তিনি যেন এই পুস্তিকার উসীলায় আমাকে তাঁর সান্নিধ্যে জান্নাতে নাঈম লাভে সাফল্য দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা একমাত্র প্রার্থনা কবূলকারী। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক।

হজ ও উমরা ফরয হওয়ার দলীল ও তা দ্রুত আদায় করা

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আপনারা জেনে রাখুন! আল্লাহ আমাকে ও আপনাদেরকে হক্ব সম্পর্কে জানার ও তা অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাহদের উপর তাঁর পবিত্র ঘর কা'বা শরীফের হজ ফরয করেছেন এবং এই হজকে ইসলামের একটি স্তম্ভ হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেনঃ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

অর্থঃ “আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ করা সেই সব মানুষের উপর ফরয, যাদের সেখানে পৌঁছার সামর্থ রয়েছে। আর যে এই নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করবে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি মোটেই মুখাপেক্ষী নন।” (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে অন্যতম সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ »

অর্থঃ ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

(১) এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ (উপাস্য) নেই, আর এই সাক্ষ্যও প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

(২) নামায প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) যাকাত প্রদান করা।

(৪) রমযানের রোযা পালন করা।

(৫) আল্লাহর সম্মানিত কাবা ঘরের হজ আদায় করা।

সাঈদ বিন মানসূর (রহঃ) তাঁর সুনান গ্রন্থে উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (উমর) বলেছেনঃ

আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু সংখ্যক লোককে শহরগুলোতে প্রেরণ করি এবং তারা খুঁজে খুঁজে দেখুক ঐ সমস্ত লোককে, যারা হজ

করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ করে না, এদের উপর তারা যেন জিযিয়া (কর) বসিয়ে দেয়। কেননা, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যারা হজ পালন করে না তারা মুসলমান নয়, তারা মুসলমান নয়।"

« من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً »

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ

যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ পরিত্যাগ করল সে ইয়াহূদী হয়ে অথবা খৃস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করুক তাতে কিছুই যায় আসে না।

যে ব্যক্তির উপর হজ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ করেনি, তার পক্ষে হজ পালন ত্বরান্বিত করা একান্ত জরুরী। কেননা, সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ - يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ

অর্থঃ তোমরা ফরয হজ আদায়ের জন্য তাড়াতাড়ি কর। কেননা, তোমাদের কেউই জানে না যে, তার ভাগ্যে কি ঘটতে পারে।"

এই হাদীস ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে সফর করার সামর্থ রাখে তার জন্য কালক্ষেপণ না করে আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক দ্রুত হজ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। স্পষ্টতঃ কুরআনের এই আয়াতে তাই ঘোষণা হয়েছেঃ

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾

অর্থঃ আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ করা সেই সব মানুষের উপর ফরয, যাদের সেখানে পৌঁছার সামর্থ আছে। আর যে এই নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করবে সে জেনে রাখুক যে আল্লাহ বিশ্বজগতের প্রতি মোটেই মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন তাঁর খুৎবায় ইরশাদ করেনঃ

« أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا »

অর্থঃ "হে মানব সমাজ! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ পালন কর।" (সহীহ মুসলিম)

উমরা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপঃ

জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম) কর্তৃক ইসলাম সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

« أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ، وَتَعْتَمِرَ ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَتُتِمَّ الْوُضُوءَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ »

অর্থঃ "ইসলাম হল এই: তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফের হজ করবে এবং উমরা পালন করবে, নাপাকী হতে (ফরজ) গোসল

করবে, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ সম্পন্ন করবে এবং রমযানের রোযা পালন করবে।"

এই হাদীসটি ইমাম খুযাইমা এবং দারাকুতনী উমর বিন খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, এই হাদীসের সনদ সঠিক ও বিশুদ্ধ।

উমরা সম্বন্ধে আরও একটি হাদীস উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেয়েদের উপর কি জিহাদ ফরয? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন,

« عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ »

অর্থঃ স্ত্রীলোকের উপর এমন জিহাদ ফরয যাতে লড়াই নেই, আর তা হচ্ছেঃ হজ ও উমরা। (আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)

হজ ও উমরা জীবনে মাত্র একবার পালন করা ফরয। এই সম্পর্কে সহীহ সূত্রে বর্ণিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসে বলা হয়েছে-

« فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ »

অর্থঃ "হজ মাত্র একবার ফরয। অতএব যদি কেউ একাধিকবার করে তাহলে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে।"

তবে নফল হজ ও উমরা বেশি বেশি পালন করাও সুন্নাত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ »

অর্থঃ "এক উমরা থেকে আর এক উমরাহ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত (সগীরা) গুনাহসমূহের কাফফারাহ স্বরূপ এবং মক্বূল (গৃহীত) হজের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

হজের উদ্দেশ্যে সফরের পূর্বে পাপাচার হতে তাওবা ও সকল প্রকার যুলুম-অন্যায় থেকে মুক্ত হওয়ার অপরিহার্যতার বর্ণনা

কোন মুসলমান যখন হজ অথবা উমরার জন্য সফরের সংকল্প করবে, তখন তার উচিত, স্বীয় পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীগণকে তাক্বওয়ার জন্য অসিয়ত করা। যেমন: আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং তাঁর নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে বিরত থাকার অসীয়ত। কারো সাথে কোন দেনা-পাওনা থাকলে তা লিখে রাখা উচিত এবং এর উপর সাক্ষী রাখবে। এতদ্ব্যতীত, তার নিজের কৃত সকল প্রকার গুনাহ হতে অবিলম্বে নিষ্ঠার সাথে তাওবা করা জরুরী। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

অর্থঃ "হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।" (সূরা নূরঃ ৩১)

তাওবার তাৎপর্য

(১) গুনাহ হতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা এবং তা পরিহার

করা, (২) পূর্বে তার দ্বারা যা সংঘটিত হয়েছে তার জন্য অনুশোচনা করা এবং (৩) জীবনে ঐরূপ কাজে ফিরে না যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করা। যদি তার নিকট কারো জান, মাল ও সম্মান সম্পর্কে দাবী-দাওয়া থাকে, তা হলে হজের সফরে বের হওয়ার পূর্বেই তা থেকে মুক্ত হওয়া, অর্থাৎ হক্ব আদায় করা অথবা হক্বদারের নিকট হতে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। যেমন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ »

অর্থঃ যদি কারো নিকট তার ভাইয়ের জান-মাল ও মান-সম্মানের উপর কোন রকম জোর-যুলুম বা অন্যায় থাকে, তবে তার নিকট ফিরিয়ে দিয়ে আজই পাক-সাফ হয়ে যাবে, সেই দিন সমাগত হওয়ার পূর্বেই যেদিন তার কাছে কোন দীনার ও দিরহাম অর্থাৎ টাকা-পয়সা থাকবে না; বরং সেদিন যদি তার নেক আমল থাকে তা হলে কিয়ামতের দিন ঐ নেক আমল হতে অন্যায় পরিমাণ নেকী কেটে নিয়ে তার দাবীদারের দাবী পূরণ করা হবে। আর যদি অন্যায়কারীর কোন নেকী না থাকে তাহলে দাবীদারের পাপের অংশ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

হজ ও উমরার খরচের জন্য পবিত্র ও হালাল মাল বেছে নিতে

হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

« أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا »

অর্থঃ হে লোক সকল! আল্লাহ পূত:পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।

এই সম্পর্কে ইমাম তাবারানী আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلاَلٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلاَلٌ، وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ»

অর্থঃ "ব্যক্তি যখন বিশুদ্ধ মাল নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে বের হয় এবং সওয়ারীর রেকাবে পা রেখে ইহরামের এই বাক্যগুলো উচ্চারণ করে আল্লাহকে ডাকেঃ

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক (তোমার নিকট আমি হাজির, হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি হাজির)

তখন আকাশ হতে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে হজের জন্য তোমার উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য এবং তুমি সৌভাগ্যবান; তোমার

পাথেয় হালাল, তোমার বাহন হালাল, তোমার হজ গ্রহণযোগ্য ও ত্রুটিমুক্ত। আর বান্দাহ যখন অপবিত্র হারাম মাল নিয়ে হজের জন্য বের হয় এবং সওয়ারীর রেকাবে পা রেখে "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" উচ্চস্বরে বলতে থাকে তখন আকাশ হতে একজন আহ্বানকারী এর জবাবে ডাক দিয়ে বলেঃ

'লা লাব্বাইকা ওয়া লা সাদাইকা' তোমার উপস্থিতি মঞ্জুর নয় এবং তোমার সৌভাগ্যও অর্জিত হবে না, তোমার পাথেয় হারাম, তোমার খরচাদি হারাম, আর তোমার হজও গ্রহণযোগ্য নয়।

হাজীদের পক্ষে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া বা অন্যের নিকট কিছু চাওয়া হতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ »

অর্থঃ "যে ব্যক্তি অপরের কাছে চাওয়া হতে বাঁচতে চায় আল্লাহ তা হতে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে আল্লাহর নিকট অভাব পূরণের কামনা করে, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত করে দেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেনঃ

« مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ »

অর্থঃ "যে ব্যক্তি মানুষের নিকট সব সময় ভিক্ষা করে বেড়ায়, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে যে, তার মুখমন্ডলে কোন মাংস থাকবে না।"

হাজীদের হজ ও উমরার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ ও পরকালের সৌভাগ্য অর্জন। এরূপ লক্ষ্য স্থির করা হাজীদের জন্য ফরয। অতএব, নির্দিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে এমন সব কথা ও আমল দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে হবে, যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। আর তাদের পক্ষে দুনিয়া তার অবস্থার চাকচিক্য হতে সতর্ক থাকা কর্তব্য। লোক দেখান বা সুনাম অর্জন এবং এর দ্বারা গর্ব প্রকাশ করা হতে নিজেকে পূর্ণ মাত্রায় দূরে রাখতে হবে। কারণ, এসব উদ্দেশ্য বড়ই জঘন্য। এগুলো তার আমল বাতিল হওয়ার এবং আল্লাহর নিকট তা গ্রাহ্য না হওয়ার কারণরূপে বিবেচিত হবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾

অর্থঃ "যারা পার্থিব জীবন এবং তার জাঁকজমকের আকাক্সক্ষা করে তাদের আমলের প্রতিদান আমি এই জগতেই দিয়ে থাকি এবং তাদেরকে এই জগতে প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র কম করা হবে না; কিন্তু এরা ঐসব লোক যাদের পরকালে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই পাওয়ার থাকবেনা। এই জগতে তারা যা কিছু করেছে সমস্তই ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল, আর যা কিছু আমল করল সবই বাতিল হয়ে গেল।" (সূরা হূদঃ ১৫-১৬)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ

وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا﴾

অর্থঃ "যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের আশু সুখ-সুবিধার আকাক্সক্ষা পোষণ করে থাকে, আমি যাকে ইচ্ছা এই জগতেই সত্ত্বর দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য নির্ধারিত করে দেই সেই জাহান্নাম যেখানে সে প্রবেশ করবে হেয় প্রতিপন্ন ভর্ৎসিত অবস্থায়। আর যে ব্যক্তি মু'মিন হয়ে আখিরাতের কল্যাণ লাভের আকাক্সক্ষা পোষণ করে এবং সেজন্য যথাযথভাবে সাধনা করে চলে, এই ধরণের লোকদের চেষ্টা-সাধনা স্বীকৃত হয়ে থাকে।" (সূরা বনি ইসরাঈলঃ ১৮-১৯)

এই সম্পর্কে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে একটি হাদীসে কুদসী সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ

« قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ »

অর্থঃ "আল্লাহ আ'আলা বলেনঃ সমস্ত শরীকদের মধ্যে আমি শিরক হতে সর্বাধিক অমুখাপেক্ষী। সুতরাং যদি কেউ কোন কাজে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে তখন আমি তাকে এবং তার শিরককে পরিত্যাগ করে থাকি।" (মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্নিত হাদীস)

হজের সফরে হজ যাত্রীকে নেক্কার, পরহেযগার এবং শরীয়তের জ্ঞানসম্পন্ন আলেমের সাহচর্য গ্রহণ করা উচিত। অপরদিকে, জাহেল এবং ফাসেক ধরণের লোকদের সংস্রব হতে সাবধান থাকা কর্তব্য।

হজ ও উমরার কার্যাবলী সম্পর্কে প্রত্যেক হজ যাত্রীর শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং ঐ সমস্ত মাসআলা জিজ্ঞাসা করা উচিত যা তার বুঝে আসে না যেন সে এ ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে যায়।

হজের উদ্দেশ্যে যখন বাড়ি হতে বের হয়ে নিজের সওয়ারী পশু অথবা মোটরগাড়ি কিংবা উড়োজাহাজ অথবা অন্য কোন বাহনে আরোহণ করবে, তখন প্রথমে বিসমিল্লাহ ও আলহাম্দুলিল্লাহ বলবে, তারপর তিনবার আল্লাহু আকবার উচ্চরণ করবে; এরপর বলবেঃ

﴿سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাজী সাখখারা লানা হা–জা, ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না ইলা রাববিনা লামুন ক্বালিবুন।

অর্থঃ “পবিত্রতা ঘোষণা করছি সেই মহান প্রভুর, যিনি আমাদের জন্য একে– (সওয়ারী বা বাহনকে) আমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন; আমরা কখনও তাকে আমাদের আয়ত্তে আনতে পারতাম না। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভুর পানে ফিরে যাব।” (সূরা যুখরুফঃ ১৩–১৪)

তারপর বলবেঃ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِى الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالأَهْلِ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ফী সাফারী হা–জা আল–বিররা ওয়াত্তাক্বওয়া, ওয়া মিনাল আমালি মা তারজা; আল্লাহুম্মা হাওয়িন আলাইনা সাফারানা হা–জা, ওয়াৎভি ‘আন্না বু’দাহু;

আল্লাহুম্মা আনতাস সাহিবু ফিস সাফারে, ওয়াল খালীফাতু ফিল আহলি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আঊজু বিকা মিন ওয়া'ছা ইস সাফারে, ওয়া কাআ বাতিল মানজারি, ওয়া সূ-য়িল মুনক্বালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার এই সফরে নেকী ও তাক্বওয়া প্রার্থনা করছি, আর এমন কাজের তাওফীক কামনা করছি যা তোমার সন্তোষ অর্জনে সক্ষম হবে। হে আল্লাহ! আমাদের এই সফরের কষ্ট তুমি লাঘব করে দাও এবং আমাদের এই সফরের দূরত্ব কম করে দাও; হে আল্লাহ! এই সফরে তুমিই আমার একমাত্র সাথী এবং আমার পরিবার-পরিজনের উপর তুমিই উত্তম স্থলাভিষিক্ত তত্তাবধায়ক; হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সফরের ক্লান্তি, অপ্রীতিকর দৃশ্য এবং আমার সম্পদ, পরিবার-পরিজনের ক্ষয়-ক্ষতি ও অশুভ পরিণতি হতে নিরাপত্তার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এই হাদীসটি সহীহ মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হজ যাত্রী তার এই সফরে আল্লাহর যিকির ও স্বীয় গুনাহের কথা স্মরণ করে অধীক মাত্রায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে এবং আল্লাহর নিকট বিনয় সহকারে তাঁর করুণা প্রার্থনা করবে। পবিত্র কুরআন পাঠ করবে এবং তার অর্থ অনুধাবনে সচেষ্ট হবে। জামা'আতে নামায আদায় করার ব্যাপারে খুব যত্নবান হবে। স্বীয় যবানকে অনর্থক কথাবার্তা হতে সংযত রাখবে। অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম ও অতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা ও তামাশামূলক কথাবার্তা হতে নিজেকে বিরত

রাখবে। স্বীয় যবানকে মিথ্যা, গীবত ও কুৎসা রটনা হতে এবং স্বীয় সহগামী ও অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হতে নিজেকে সংযত রাখবে।

এতদ্ব্যতীত অনান্য হজযাত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সচেষ্ট হবে, সাধ্যমত সুকৌশলে এবং মিষ্টিভাষায় তাদেরকে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অপ্রিয় কাজ হতে বিরত থাকার জন্য নসীহত করবে।

মীক্বাতে পৌঁছে হাজীদের জন্য যা যা করণীয়

হজযাত্রী যখন মীক্বাতে (ইহরাম বাঁধার নির্দিষ্ট স্থানে) পৌঁছবে তখন তার জন্য মুস্তাহাব হলো গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইহরামের সময় সেলাইকৃত কাপড় হতে মুক্ত হতেন এবং গোসল করতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»

অর্থঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইহরাম বাঁধার পূর্বে তাঁর ইহরাম বাধার জন্য সুগন্ধি মাখাতাম এবং আল্লাহর ঘর ত্বাওয়াফ করার পূর্বে তার হালাল হওয়ার পর সুগন্ধি মাখাতাম।"

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর উমরা পালনের জন্য ইহরাম

বাধার পর যখন রক্তস্রাব হয়ে গেল তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে গোসল করতে বলেন এবং হজের ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন। এভাবে আসমা বিনতে উমাইস যখন যুলহুলাইফা নামক স্থানে সন্তান প্রসব করলেন তখন তাঁকেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোসল করার এবং লজ্জাস্থানে কাপড়ের টুকরা এঁটে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ প্রদান করেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, কোন স্ত্রীলোক মীক্বাতে পৌঁছে হায়েযগ্রস্ত বা সন্তান প্রসবজনিত স্রাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে অন্যদের মত গোসল করে ইহরাম বাঁধবে এবং অন্যান্য হাজীগণ যা করবে সেই মহিলাও তাই করতে থাকবে। তবে সেই অবস্থায় তার পক্ষে কা বা শরীফের ত্বাওয়াফ করা জায়েয হবে না, যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়েশা ও আসমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কে এই অবস্থায় ত্বাওয়াফ না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

যখন কোন ব্যক্তি ইহরাম বাধার ইচ্ছা করবে তখন সে যেন তার গোঁফ, নখ, নাভির নিম্নস্থ লোম ও উভয় বগলের লোম পরিস্কার করার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে। অতএব সেগুলো কাটা-ছাঁটার প্রয়োজন হলে তা করে নিবে, যাতে ইহরাম বাধার পর প্রয়োজন না পড়ে। কেননা ইহরাম অবস্থায় এগুলো কাটা-ছাঁটা তার জন্য হারাম হবে এবং সাধারণতই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলমানদের বেলায় এগুলো সর্বদা পরিস্কার রাখার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

«الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الآبَاطِ»

অর্থঃ "ইসলামের স্বভাবজাত (সুন্নাত) বিষয় হচ্ছে পাঁচটিঃ খতনা করা, নাভির নিচের লোম কামানো, গোঁফ কেটে ছোট করা, নখ কাটা এবং উভয় বগলের লোম উৎপাটন করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

সহীহ মুসলিম শরীফে আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

« وُقِّتَ لَنَا فِى قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً »

অর্থঃ "গোঁফ কাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উৎপাটন করা ও নাভির নিম্নস্থ লোম কামানোর ব্যাপারে আমাদের সময় সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যেন চল্লিশ দিনের অধিক আমরা এগুলো ছেড়ে না দেই।" (অর্থাৎ এগুলো কর্তন, উৎপাটন বা কামানোর বেলায় যেন চল্লিশ দিনের অধিক সময় অতিক্রম না করে।)

ইমাম নাসায়ী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের ভাষায়ঃ

« وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ -ﷺ- »

অর্থঃ "(এসব কাজের বেলায়) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।"

ইমাম নাসায়ী (রহঃ)-এর ভাষায় এই হাদীসটি ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

মাথার চুল সম্পর্কে কথা হলো যে, পুরুষ অথবা মহিলা হউন কারো জন্যেই ইহরাম বাধার সময় মাথার চুল কাটা শরীয়তসম্মত নয়। আর দাড়ি সম্পর্কে বিধান হলোঃ তা মুণ্ডন করা বা তার কিছু অংশ কর্তন করা সব সময়ই হারাম; বরং দাড়ি পূর্ণ করে ও বর্ধিত করে রাখা ওয়াজিব। কেননা, বুখারী ও মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ »

অর্থঃ "তোমরা মুশরিকদের বিপরীত আচরণ কর, দাড়ি বর্ধিত ও পূর্ণ করে রাখো এবং গোঁফ ছোট করো।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ করেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ »

অর্থঃ "তোমরা গোঁফ কেটে ছোট করো, দাড়ি ছেড়ে বর্ধিত করে রাখো এবং অগ্নিপূজকদের বিপরীত আচরণ করো।" (মুসলিম)

বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোক, বিশেষ করে শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টগণ কর্তৃক এই সুন্নাতের বিরোধিতা ও দাড়ির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া এবং স্ত্রীলোক ও কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যপনায় সন্তোষ প্রকাশের ফলে মহাবিপদ দেখা দিয়েছে। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'।

আল্লাহ তায়ালার কাছে দুয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে সুন্নাতে রাসূল মেনে চলার এবং তাকে শক্ত করে

আঁকড়ে ধরার ও তার প্রতি লোকদের আহ্বান জানানোর পথে পরিচালিত করেন, যদিও অধিকাংশ লোক এই সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়ে রয়েছে। মহান আল্লাহ পাকই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। সুমহান ঊর্দ্ধতন আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো কোন শক্তি-সামর্থ নেই।

পুরুষ (সেলাইবিহীন) একখানা লুঙ্গি ও একখানা চাদর পরিধান করবে। লুঙ্গি ও চাদর উভয়টি সাদা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া মুস্তাহাব। আর ইহরাম বাঁধার সময় একজোড়া জুতা পরিধান করাও মুস্তাহাব। এর প্রমাণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিম্নোক্ত বাণীঃ

« وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ »

অর্থঃ "তোমাদের প্রত্যেকে ইহরাম বাঁধার সময় যেন একটি লুঙ্গি, একটি চাদর ও একজোড়া জুতা পরিধান করে।" (ইমাম আহমদ)

মহিলাদের যে কোন পোশাকে ইহরাম বাঁধা জায়েয

সবুজ অথবা অন্য যে কোন রঙের কাপড় পরিধান করে ইহরাম বাঁধা জায়েয আছে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, পুরুষদের পোশাকের সাথে তাদের পোশাকের যেন কোন সাদৃশ্য না থাকে।

সাধারণ কতিপয় লোকের মেয়েদের ইহরামের জন্য অন্য রং বাদ দিয়ে শুধু সবুজ অথবা কালো রং এর কাপড় নির্দিষ্ট করা, শরীয়তে এর কোন দলীল-প্রমাণ নেই।

গোসল ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর ইচ্ছানুযায়ী হজ অথবা উমরায় প্রবেশের অন্তর দ্বারা নিয়ত

করবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى »

অর্থঃ "যাবতীয় কাজ-কর্ম নিয়তের উপরই নির্ভর করে। প্রতিটি লোক যা নিয়ত করে সেই অনুযায়ী প্রতিফল পায়।"

হজ বা উমরা যার সে নিয়ত করবে অন্তরে নিয়ত করত: মুখে উচ্চারণ করে নিুরূপ বলবে। যদি তার উমরার নিয়ত হয় তা হলে সে বলবেঃ

লাব্বাইকা উমরাতান অথবা বলবেঃ আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান

অর্থঃ আমি উমরা পালনের উদ্দেশ্যে তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি। অথবা হে আল্লাহ! আমি উমরা পালনের নিয়তে তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি।

আর যদি তার হজের নিয়ত হয় তা হলে বলবেঃ

لَبَّيْكَ حَجاًّ، أو يقول: اللهمَّ لَبَّيْكَ حَجاًّ

উচ্চারণঃ লাব্বাইকা হাজ্জান অথবা বলবেঃ আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান

অর্থঃ আমি হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি, অথবা, হে আল্লাহ! আমি হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি। কেননা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ করেছেন।

সবচেয়ে উত্তম হলো, সে তার বাহনে আরোহণ করার পর উক্ত দোয়া উচ্চারণ করবে, সেই বাহন কোন জন্তু, মোটর গাড়ি অথবা

অন্য যা কিছু হোক। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখনই তালবিয়াহ উচ্চারণ করেন যখন তিনি তাঁর সওয়ারীর উপর আরোহণ করেন এবং সওয়ারী তাঁকে নিয়ে মীক্বাত থেকে যাত্রা শুরু করার জন্য উদ্যোত হয়। এটাই আলেমগণের বিশুদ্ধতম অভিমত।

যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে কেবলমাত্র ইহরামের নিয়তের সময় উক্ত দোয়া উচ্চারণের কথা বর্ণিত আছে সেহেতু বিশেষ করে ইহরাম ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে নিয়তের শাব্দিক উচ্চারণ শরীয়তসম্মত নয়।

অতএব, নামায, ত্বাওয়াফ ও অন্যান্য কোন ইবাদতে নিয়তের শাব্দিক উচ্চারণ করা উচিত নয়। সুতরাং কেউ যেন না বলেঃ (নাওয়াইতু আন উসল্লিয়া----।) আমি এই এই নামায পড়ার নিয়ত করলাম, অথবা এই ত্বাওয়াফের নিয়ত করলাম। বস্তুতঃ নিয়তের উচ্চারণ একটি নবপ্রবর্তিত বিষয় এবং উচ্চস্বরে বলা আরো জঘন্য ও শক্ত গুনাহের কাজ। যদি নিয়তের শাব্দিক উচ্চারণ শরীয়তসম্মত হতো তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বিষয়টি বর্ণনা করতেন, তাঁর উম্মতকে স্বীয় কাজ বা কথার দ্বারা স্পষ্ট করে দিতেন এবং পূর্বসূরী সালাফে সালেহীন তা আমাদের পূর্বে অবশ্যই পালন করে যেতেন।

সুতরাং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে যখন এর কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি এবং তাঁর সাহাবা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকেও যখন এর কোন বর্ণনা আসেনি তখন একথা নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, তা একটি বিদ আত (নবপ্রবর্তিত বিষয়)। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ »

অর্থঃ ধর্মে সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হলো নবপ্রবর্তিত বিষয়াদি এবং প্রতিটি বিদআতই (নবপ্রবর্তিত বিষয়) পথভ্রষ্টতা। (সহীহ মুসলিম)

স্থানগত মীক্বাতসমূহ ও তার সীমারেখার বর্ণনা

ইহরামের স্থানগত মীক্বাত পাঁচটি। যথাঃ

১। প্রথম মীক্বাতঃ যুলহুলাইফা এটা মদীনাবাসীদের মীক্বাত। আজকাল জনসাধারণের মধ্যে তা আবইয়ারে আলী নামে পরিচিত।

২। দ্বিতীয় মীক্বাতঃ আলজুহফা: তা সিরিয়াবাসীদের (তথা ঐদিক থেকে আগতদের) মীকাত। আলজুহফা রাবিগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি বিধ্বস্ত গ্রাম। বর্তমানে লোক রাবিগ থেকেই ইহরাম বাঁধে এবং যে রাবিগ থেকে ইহরাম বাঁধে, প্রকৃতপক্ষে মীক্বাত থেকেই তার ইহরাম বাঁধা হয়। কারণ, রাবিগের কিছুটা আগেই জুহফা অবস্থিত।

৩। তৃতীয় মীক্বাতঃ 'ক্বারনুল মানাযিল' এটা নজদবাসীদের (ঐদিক যেমন: মিডল ইষ্ট থেকে আগতদের) মীক্বাত। বর্তমানে এর নাম হয়েছে আস্সায়েল আল-কাবীর।

৪। চতুর্থ মীক্বাতঃ 'ইয়ালামলাম' এটা ইয়ামানবাসীদের (ঐদিক যেমন: ভারত উপমহাদেশ থেকে আগতদের) মীক্বাত।

৫। পঞ্চম মীক্বাতঃ 'যাতু ইরক্ব' এটা ইরাকবাসীদের (তথা ঐদিক থেকে আগতদের) মীক্বাত।

এই মীক্বাতগুলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখিত এলাকাবাসী এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য স্থানের লোক যারা

হজ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে ঐস্থানগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি ঐ মীক্বাতগুলোর কোন একটি দিয়ে অতিক্রম করবে তার ঐ স্থানেই ইহরাম বাধা ওয়াজিব হবে। বিনা ইহরামে ঐ স্থান অতিক্রম করা তার জন্য হারাম হবে। যদি সে হজ বা উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখে; সে স্থলপথে অতিক্রম করুক আর জলপথে করুক সমান কথা। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন এই মীক্বাতগুলো নির্ধারণ করেন তখন তা ব্যাপক অর্থেই বলেছেন। তিনি বলেছেনঃ

« فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ».

অর্থঃ "এই মীক্বাতগুলো সেই এলাকা বাসীদের জন্য এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য এলাকার যারা হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে এগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে।"

যে ব্যক্তি হজ বা উমরার উদ্দেশ্যে আকাশ পথে রওয়ানা হবে তার জন্য শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হলো, সে যেন বিমানে আরোহণের পূর্বে গোসল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সেরে নিয়ে ইহরামের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। আর যখনই সে মীক্বাতের নিকটবর্তী হবে তখনই লুঙ্গি ও চাদর পরে নিবে। তারপর (হজের পূর্বে) বিস্তর সময় থাকলে উমরার উদ্দেশ্যে 'লাব্বাইকা---- অর্থাৎ তালবিয়া বলে ইহরাম বাঁধবে। আর সংকীর্ণ হলে সরাসরি হজের উদ্দেশ্যে 'লাব্বাইকা বলে ইহরাম বেঁধে নিবে। যদি বিমানে আরোহণের পূর্বে অথবা মীক্বাতের নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বে সে লুঙ্গি ও চাদর পরে নেয় তাহলে এতে কোন দোষ নেই, তবে সে উমরা বা হজ কর্মে প্রবেশের নিয়ত তখন

করতে পারবে না এবং এই উদ্দেশ্যে 'লাব্বাইকা ও বলতে পারবে না। তা কেবল তখনই করবে যখন সে মীক্বাতের বরাবর অথবা তার নিকটবর্তী হবে। কেননা, নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মীক্বাত থেকেই ইহরাম বেধে ছিলেন। আর উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর ওয়াজিব হলো, ধর্মের অন্যান্য বিষয়াদির ন্যায় এই ব্যাপারেও তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্ণ অনুসরণ করা। কারণঃ আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

অর্থঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (সূরা আহযাবঃ ২১)

দ্বিতীয়তঃ বিদায় হজে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« خُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ »

অর্থঃ "তোমরা আমার নিকট থেকে হজ ও উমরার কার্যাবলীর শিক্ষা গ্রহণ করো।"

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি হজ বা উমরা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হয় যেমন ব্যবসায়ী, কাঠ সংগ্রহকারী, ডাক-পিয়ন ইত্যাদি, তাদের জন্য মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়। তবে হ্যাঁ, সে নিজে যদি তার ইচ্ছে করে। এর প্রমাণ, মীক্বাত সমূহের বর্ণনা কালে পূর্বোল্লিখিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসঃ

« فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ

وَالْعُمْرَةَ »

অর্থঃ “এই মীক্বাতগুলো সেই এলাবাসীদের জন্য এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য এলাকার লোকের জন্য যারা হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে এগুলোর উপর দিয়ে অতিক্রম করবে।”

এর মর্মার্থ হলোঃ যে ব্যক্তি কোন মীক্বাত অতিক্রম করে এবং হজ বা উমরা পালনের কোন ইচ্ছা তার না থাকে, তা হলে তার উপর ইহরাম বাঁধা জরুরী নয়। এটা স্বীয় বান্দাদের প্রতি আল্লাহ পাকের রহমত ও তাদের উপর ইবাদত সহজকরণের একটি উদাহরণ। তজ্জন্য তাঁর হামদ ও শুকর জ্ঞাপন করি।

উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন করে নিুের ঘটনাঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি ইহরাম বাঁধেননি; বরং তিনি লৌহ শিরোস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। কারণ, তখনকার সময়ে তাঁর হজ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্য ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল, মক্কা শরীফ বিজয় এবং সেখান থেকে সর্বপ্রকার শিরকের মূলোৎপাটন।

অপরদিকে, যার বাসস্থান মীক্বাতের অভ্যন্তরে যেমনঃ জেদ্দা, উম্মে সালাম, বাহ্রা, শারায়ে অ, বদর, মাস্তুরাহ ইত্যাদি, তার জন্য হজ বা উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য উপরোক্ত পাঁচ মীক্বাতের কোন একটিতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং তার বাসস্থানই তার জন্য মীক্বাত। সেখান থেকেই সে ইচ্ছামত হজ বা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধতে পারবে।

আর যদি তার আরেকটি বাসস্থান মীক্বাতের বাইরে থেকে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার জন্য এখতিয়ার থাকবে; ইচ্ছা করলে মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধবে, অথবা ইচ্ছা করলে মীক্বাত থেকে মক্কার দিকে

অধিক নিকটবর্তী তার বাসস্থান থেকে ইহরাম বাধতে পারবে। কেননা, ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে মীক্বাত প্রসঙ্গে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী ব্যাপক অর্থে উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

«وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذَلِكَ فَمَهِلُّهُ(١) مِنْ أَهْلِهِ حَتَى أَهْلُ مَكَةَ يَهِلّونَ مِن مَكَةَ »

অর্থঃ "যে ব্যক্তি মীক্বাতের ভিতরে অবস্থান করে তার ইহরাম বাঁধার স্থান হলো তার বাসস্থান। এমনকি (হজের জন্য) মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

তবে কেউ যদি হারাম সীমার অভ্যন্তরে থাকাবস্থায় উমরা আদায়ের ইচ্ছা করে তাহলে তাকে হারামের বাইরে হালাল এলাকায় গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বেধে আসতে হবে। কেননা, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন উমরা আদায় করতে চাইলেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়েশার ভাই আব্দুর রহমানকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন আয়েশাকে হারামের বাইরে হালাল এলাকায় নিয়ে যান এবং সেখান থেকে ইহরাম বেধে আসেন।

এতে প্রমাণিত হলো যে, উমরা পালনকারী ব্যক্তি উমরার জন্য হারামের ভিতর থেকে ইহরাম বাধতে পারবে না; বরং তাকে হারামের বাইরে হালাল এলাকা থেকে ইহরাম বেধে আসতে হবে।

---

(١) فمهله: أي: إهلاله بالتلبية من مكان إحرامه.

আয়েশার এই হাদীস ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত পূর্বোল্লিখিত হাদীসের মর্মার্থ খাস অর্থাৎ নির্দিষ্ট করে দিল এবং বুঝা গেল যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তিঃ

«حَتَى أَهْلُ مَكَةَ يهِلّونَ مِن مَكَةَ»

"এমন কি, মক্কাবাসীরাও মক্কা থেকে ইহরাম বাঁধবে" যা কেবলমাত্র হজের জন্য প্রযোজ্য, উমরার জন্য নয়। কেননা, যদি উমরার জন্য হারাম থেকে ইহরাম বাঁধা জায়েয হতো তা হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আয়েশাকে এর অনুমতি দিতেন এবং হারামের বাইরে গিয়ে হালাল এলাকা থেকে ইহরাম বাঁধার জন্য কষ্ট স্বীকারের নির্দেশ দিতেন না। বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। এটিই অধিকাংশ উলামার অভিমত এবং মু মিনদের জন্য অধিকতর নিরাপদ পন্থা। কারণ, এর দ্বারা উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়। আল্লাহই আমাদের তাওফীকদাতা।

কোন কোন লোক হজের পর তানয়ীম (আয়েশা মসজিদ), জির রানা অথবা অন্যান্য স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে অধিক সংখ্যক উমরা আদায় করতে সচেষ্ট হন-অথচ সে হজের পূর্বে উমরা আদায় করে ফেলেছে-এর বৈধতার সপক্ষে কোন দলীল-প্রমাণ নেই; বরং দলীল-প্রমাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে, তা না করাই শ্রেয়। কেননা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাগণ হজ সমাপনের পর কোন উমরা করেননি। কেবলমাত্র আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তানয়ীম থেকে ইহরাম বেঁধে উমরা করেছিলেন। তার কারণ এই যে, হজের পূর্বে তাঁর রক্তস্রাব শুরু হওয়ার কারণে তিনি মক্কায়

প্রবেশকালে লোকদের সাথে উমরা সম্পাদন করতে পারেননি। তাই তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে মীক্বাত থেকে যে উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন তার পরিবর্তে একটি উমরা সম্পাদন করতে চাইলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে এর অনুমতি দিলেন। ফলে, আয়েশার দু টি উমরা অর্জিত হলোঃ একটি হজের সাথে এবং অপরটি এই পৃথক উমরা। সুতরাং কেউ যদি আয়েশার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তাহলে তার জন্যও হজের পর উমরা পালনে কোন বাধা নেই এবং এটা হবে শরীয়তের যাবতীয় দলীল মোতাবেক ও মুসলমানদের প্রতি ধর্মীয় প্রশস্ততা।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হজের পর হাজীদের মক্কায় প্রবেশকালীন উমরা ব্যতীত আরেকটি উমরা করতে সচেষ্ট হওয়া সকলের জন্যই কষ্টকর হয় এবং এতে ভীড় ও বহু দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। উপরন্ত, এর মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত ও হেদায়েতের বিরোধিতা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। আল্লাহই আমাদের তাওফীক দানকারী।

যারা হজের মৌসুম ছাড়া অন্য সময়ে মীক্বাতে পৌঁছে তাদের যা করণীয়

জেনে রাখুন! মীক্বাতে যে উপনীত হয় তার দুই অবস্থা হবেঃ-

একঃ হজের মৌসুম ছাড়া অন্য যে কোন সময়, যেমনঃ রমযান, শা'বান মাসে মীক্বাতে উপনীত হবে, তখন তার ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো সে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে। মনে মনে নিয়ত করবে এবং মুখে উচ্চারণ করে বলবেঃ

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"লাব্বাইকা উমরাতান"

অর্থঃ "(আল্লাহ) আমি উমরা আদায়ের জন্য তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত।" অথবা বলবেঃ

اللهم لَبَّيْكَ عُمْرَةً

"আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি উমরা আদায়ের জন্য তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত।"

অতঃপর সে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'তালবিয়াহ' পাঠ করবে, আর তা হলোঃ

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ»

উচ্চারণঃ 'লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল

মুলক, লা–শারীকা লাক'।

অর্থঃ "আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত, তোমার কোনই অংশীদার নেই, তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি উপস্থিত, সর্বপ্রকার প্রশংসা এবং নি আমত সামগ্রী সবকিছুই তোমার, সর্বত্র তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন অংশীদার নেই।"

কা'বা শরীফে পৌঁছা পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার যিকির এবং এই তালবিয়াহ বেশি বেশি করে বলতে থাকবে।

যখন বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট পৌঁছবে তখন তালবিয়াহ উচ্চারণ থেকে বিরত হয়ে যাবে, বায়তুল্লাহ শরীফ সাত চক্রে ত্বাওয়াফ করবে এবং মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাক'আত নামায আদায় করবে। অতঃপর সাফা পাহাড়ের দিকে যাবে এবং সাফা ও মারওয়া উভয় পাহাড়ের মধ্যে সাতচক্রে সায়ী করবে। তারপর মাথার চুল মুণ্ডন করবে অথবা তা ছোট করবে। এর দ্বারাই তার উমরার সমাপ্তি ঘটবে এবং ইহরাম বাধার ফলে তার জন্য যা যা হারাম হয়ে গিয়েছিল সেগুলো হালাল হয়ে যাবে।

দুইঃ সে হজের মাসগুলোর মধ্যে মীক্বাতে পৌঁছবে। এই মাসগুলো হলোঃ শাওয়াল, জিলক্বদ ও জিলহজ মাসের প্রথম দশদিন।

যে লোক এই দ্বিতীয় অবস্থায় মীক্বাতে উপনীত হবে তার জন্য নিুোক্ত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি অবলম্বনের স্বাধীনতা থাকবে। বিষয়গুলো হলোঃ

১। কেবলমাত্র হজ, ২। কেবলমাত্র উমরা ৩। হজ ও উমরা একত্রে।

কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন বিদায় হজের সময় জিলক্বাদ মাসে মীক্বাতে পৌঁছেন তখন সাহাবাগণকে এই তিনিটি বিষয়ের যে কোন একটি অবলম্বনের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তবে এটাও সুন্নাত যে, তার সাথে যদি কুরবানীর পশু না থাকে তাহলে সে কেবলমাত্র উমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে এবং হজ মৌসুমের বাইরে মীক্বাতে আগমনকারীর ন্যায় সবকিছু করবে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, সাহাবাগণ মক্কার নিকটবর্তী হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের ইহরামকে উমরার ইহরাম হিসেবে গণ্য করার নির্দেশ দেন এবং মক্কায় পৌঁছে এর তাকিদও করেন। তার নির্দেশ মোতাবেক সাহাবাগণ আল্লাহর ঘর ত্বাওয়াফ করলেন, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সায়ী করলেন, মাথার চুল ছোট করলেন এবং ইহরাম খুলে হালাল হয়ে গেলেন; কিন্তু তাঁদের মধ্যে যার সাথে কুরবানীর জন্তু ছিল তাঁকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিলেন, সে যেন কুরবানীর দিন অর্থাৎ ১০ই জিলহজ হালাল না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় বহাল থাকে।

আর যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্তু চালিয়ে আসে তার জন্য সুন্নাত হলোঃ হজ ও উমরা উভয়টির জন্য ইহরাম বাঁধা। কেননা, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেটাই করেছিলেন। তিনি কুরবানীর জন্তু চালিয়ে আসছিলেন। আর যে সব সাহাবায়ে কিরাম কুরবানীর পশু চালিয়ে আসছিলেন এবং শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন তারা যেন উমরার সাথে হজেরও তালবিয়াহ পাঠ করে এবং কুরবানীর দিন হালাল না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম না খোলে। আর যে ব্যক্তি কুরবানীর জন্তু চালিয়ে শুধু হজ সম্পাদনের জন্য ইহরাম বেঁধেছে সে তার ইহরাম অবস্থায় বহাল

থাকবে এবং ক্বিরান হজ সম্পাদনকারীর ন্যায় কুরবানীর দিন হালাল হবে।

এতদ্বারা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি শুধু হজের জন্য অথবা হজ ও উমরা আদায়ের জন্য ইহরাম বাঁধে এবং তার সাথে কুরবানীর কোন পশু থাকে না, তার জন্য উমরা আদায়ের পর ইহরাম অবস্থায় থাকা উচিত নয়; বরং তার জন্য সুন্নাত হলোঃ সে তার ইহরামকে শুধু উমরার জন্য গণ্য করবে এবং ত্বাওয়াফ, সায়ী ও মাথার চুল ছোট করে ইহরাম ছেড়ে দিবে। যেভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐসব সাহাবাকে করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যারা হাদি অর্থাৎ কুরবানীর পশু চালিয়ে আসেনি। হ্যাঁ, তবে যদি দেরীতে মক্কায় আগমনের কারণে হজ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার জন্য ইহরাম অবস্থায় থাকতে কোন আপত্তি নেই। আল্লাহই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি রুগ্ন হওয়ার অথবা কোন শত্রূ বা এ জাতীয় কোন কিছুর কারণে উমরার কার্যাবলী সম্পদন করতে অসমর্থ হওয়ার আশঙ্কাবোধ করে তখন তার জন্য ইহরামের সময় শর্তারোপ করে একথা বলা মুস্তাহাবঃ

((فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني))

উচ্চারণঃ ফা-ইন হাবাসানী হা-বিসুন ফা-মাহাল্লী হাইসু হাবাসতানী।

অর্থঃ "যদি হজ বা উমরা পালনে কোন বাধা দানকারী বাধা দেয় তাহলে, হে আল্লাহ! যেখানেই তুমি আমাকে বাধা প্রদান করবে সেখানেই আমি ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাব।"

জুবা আ বিনতে যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত

হাদীস এর প্রমাণ। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলেছিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ পালনের ইচ্ছা করেছি; কিন্তু আমি অসুস্থ। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেনঃ

« حُجِّى وَاشْتَرِطِى أَنَّ مَحِلِّى حَيْثُ حَبَسْتَنِى »

অর্থঃ "তুমি হজ (বিধান) পালন করে যাও এবং শর্তারোপ করে বলো, 'হে আল্লাহ! যেখানে তুমি আমাকে বাধা প্রদান করবে সেখানেই আমার ইহরাম শেষ হয়ে যাবে।' (বুখারী ও মুসলিম)

এই শর্তের উপকারীতাঃ মুহরিম ব্যক্তি যদি এমন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যেমনঃ অসুস্থতা বা শত্রু আক্রমণ ইত্যাদি যা তার উমরা বা হজের কার্যাবলী পূর্ণ করতে বাধা দিবে, তবে তার জন্য হালাল হয়ে যাওয়া জায়েয হবে, এতে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ (দম) ওয়াজিব হবে না।

ছোট বালক-বালিকার হজের হুকুম- এ হজ কি তার ইসলামী ফরয হজের জন্য যথেষ্ট হবে?

ছোট ছোট বালক-বালিকার হজ শুদ্ধ হবে। এর প্রমাণঃ সহীহ মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেনঃ "জনৈক মহিলা একটি শিশুপুত্রকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে তুলে ধরে বললোঃ হে আল্লাহ রাসূল! এই বাচ্চার কি হজ আছে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেনঃ

« نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ »

অর্থঃ "হ্যাঁ, এর হজ আছে, আর এতে তোমার সওয়াব হবে।"

সহীহ বুখারীতে সাঈদ বিন ইয়াযীদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ

« حُجَّ بِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ »

অর্থঃ "আমাকে নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হজ করানো হয়েছে, আর আমি তখন সাত বছরের বালক ছিলাম।"

তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার এই হজ তাদের উপর ফরয ইসলামী হজ হিসেবে আদায় হবে না। এভাবে কৃতদাস ও কৃতদাসীদেরও হজ হবে। তবে তা তাদের উপর ফরয হজ হিসেবে আদায় হবে না। এর প্রমাণ হলোঃ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى »

অর্থঃ "যে কোন বালক হজ করলো, তারপর সে বালেগ হলো, তখন (সমর্থ হলে) তাকে আরেকটি হজ করতে হবে। এভাবে কোন কৃতদাস হজ করলো, তারপর সে আযাদ হয়ে গেল, তখন (সমর্থ হলে) তাকে আরেকটি হজ আদায় করতে হবে।" (ইবনে আবী শায়বাহ ও বায়হাক্বী "হাসান" সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

আর কোন বালক যদি ভালো-মন্দ পার্থক্য করণের বোধশক্তি সম্পন্ন না হয় তা হলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক ইহরামের নিয়ত করবে এবং বালককে সেলাইকৃত লেবাস থেকে মুক্ত করে তার পক্ষ থেকে তালবিয়াহ পাঠ করবে। এর দ্বারা বালকটি মুহরিম

হয়ে যাবে এবং তখন তার জন্য ঐসব বিষয় নিষিদ্ধ হয়ে যাবে যা বয়স্ক মুহরিমের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। এভাবে ভালো-মন্দ পার্থক্যকরণের বোধশক্তি সম্পন্ন নয় এমন বালিকার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক ইহরামের নিয়ত করবে এবং তালবিয়াহ পাঠ করবে। এখন বালিকাও ইহরামকারীনি হলো। ফলে, একজন বয়স্ক মহিলা ইহরামকারীর পক্ষে যা নিষিদ্ধ হবে সেই বালিকার জন্যও তা নিষিদ্ধ। আর ত্বাওয়াফ করার সময় তাদের উভয়ের শরীর ও কাপড় পাক-পবিত্র হতে হবে। কেননা, ত্বাওয়াফ নামাযের সদৃশ্য এবং পবিত্রতা নামায পরিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত।

আর যদি বালক ও বালিকা ভালো-মন্দ পার্থক্যকরণের বোধশক্তি সম্পন্ন হয় তা হলে তারা তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে ইহরাম বাঁধবে এবং উভয়ে ইহরাম বাঁধার সময় সেই সব কাজগুলো সম্পাদন করবে যা বয়স্ক লোক ইহরাম বাঁধার সময় করে থাকে। যেমনঃ গোসলা করা, খুশবু ব্যবহার ইত্যাদি। তাদের হজ সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ যাবতীয় ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করবে তাদের অভিভাবক; তিনি তাদের পিতা হোন, মাতা হোন অথবা অন্য কেউ। বালক-বালিকা যে সব কাজ করতে অক্ষম হবে যেমন, কঙ্কর নিক্ষেপ বা অনুরূপ কাজ, অভিভাবক তাদের পক্ষ থেকে তা সম্পাদন করবে। এছাড়া হজের অন্যান্য কাজগুলো তারা নিজেরাই সমাধা করবে; যেমনঃ আরাফাতে অবস্থান, মিনা ও মুযদালিফায় রাত্রি যাপন এবং ত্বাওয়াফ ও সায়ী। যদি বালক বা বালিকা ত্বাওয়াফ ও সায়ী করতে অক্ষম হয় তা হলে তাদেরকে বহন করে তাদের ত্বাওয়াফ ও সায়ী করাতে হবে। এমতাবস্থায় বহনকারীর তাদের ও তার ত্বাওয়াফ ও সা'য়ী একসাথে এক নিয়তে না করা উত্তম; বরং তাদের জন্য ত্বাওয়াফের নিয়ত করবে এবং নিজের জন্য পৃথক ত্বাওয়াফ ও পৃথক

সায়ী করবে। ইবাদাতের ক্ষেত্রে এটাই সতর্কতামূলক পন্থা এবং এই হাদীসের সঠিক বাস্তবায়নঃ

« دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ »

অর্থঃ “যা তোমাকে সন্দেহে পতিত করে তা পরিহার করে যা সন্দেহ মুক্ত তার উপর আমল কর।”

তবে বাহনকারী যদি ত্বাওয়াফে নিজের ও বহনকৃত বালক বা বালিকার পক্ষ থেকে নিয়ত করে এবং এভাবে সায়ী করতে নিজের ও বহনকৃত বালক বা বালিকার পক্ষ থেকে নিয়ত করে তাহলে বিজ্ঞ আলেমগণের বিশুদ্ধতম অভিমত অনুসারে উভয়ের ত্বাওয়াফ ও সায়ী আদায় হয়ে যাবে। কেননা, যে স্ত্রীলোক বাচ্চার হজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বাচ্চার জন্য পৃথক ত্বাওয়াফ করার নির্দেশ দেননি। যদি পৃথক ত্বাওয়াফ ওয়াজিব হত তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট করে বলে দিতেন। আল্লাহ পাকই আমাদের তাওফীক দাতা।

ভালো-মন্দ পার্থক্যকরণের বোধশক্তি সম্পন্ন বালক ও বালিদেরকে ত্বাওয়াফ শুরু করার পূর্বে বয়স্ক মুহরিমের মত সর্বপ্রকার অপবিত্রতা থেকে পাক-পবিত্র ও ওযূ অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিতে হবে। জ্ঞাতব্য যে, ছোট ছোট বালক ও বালিকার পক্ষ থেকে ইহরাম বাঁধা অভিভাবকের উপর ওয়াজিব নয়; বরং নফল। অভিভাবক যদি তা করে তাহলে সে তার প্রতিফল পাবে, আর যদি না করে তাহলে সেজন্য তার কোন দোষ হবে না। আল্লাহ পাকই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ও ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য যা বৈধ তার বর্ণনা

১। ইহরামের নিয়ত করার পর মুহরিম ব্যক্তির (ইহরামকারীর পক্ষে সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক– নিজের চুল বা নখ থেকে কিছু কাটা অথবা কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয হবে না।

২। মুহরিম ব্যক্তি বিশেষ করে মুহরিম পুরুষের বেলায় সার্বিকভাবে সেলাইকৃত কোন প্রকার কাপড় পরিধান করা জায়েয নয়। অর্থাৎ এমন কাপড় যা তার শারিরীক কাঠামোর ভিত্তিতে কর্তন ও সেলাই করা হয়েছে। যেমনঃ জামা–কামীজ ইত্যাদি; অথবা যা আংশিকভাবে সেলাই করা হয়েছে। যেমনঃ গেঞ্জী, পায়জামা, চামড়ার মোজা, সুতার মোজা ইত্যাদি। তবে কেউ যদি না পায় তাহলে সে পায়জামা পরতে পারবে। এভাবে, কেউ যদি জুতা না পায় তাহলে তার জন্য চামড়ার মোজা পরিধান করা জায়েয আছে। তবে এক্ষেত্রে তাকে মোজার উপর থেকে কাটার কোন প্রয়োজন হবে না। কেননা, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

«مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ»

অর্থঃ "যে ব্যক্তি জুতা না পাবে সে চামড়ার মোজা পরিধান করবে; আর যে ব্যক্তি লুঙ্গী না পাবে সে পায়জামা পরিধান করবে।"

আর আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে জুতা না পেলে প্রয়োজন হলে চামড়ার মোজা পরিধানের

বেলায় তার উপরাংশ কর্তনের যে আদেশ পাওয়া যায়, তা মানসূখ অর্থাৎ এই আদেশ রহিত হয়ে গেছে। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মদীনায় ছিলেন তখন মুহরিমের পক্ষে পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে এই আদেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তিনি আরাফার ময়দানে খুতবা প্রদান করেন তখন তিনি জুতা না পেলে চামড়ার মোজা পরিধানের অনুমতি দান করেন। তখন ঐ মোজাদ্বয়ের উপরাংশ কর্তনের কোন আদেশ দেননি। এই খুতবা প্রদানের সময় এমন লোকও ছিল যারা মদীনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জবাব শুনেননি এবং প্রয়োজন মুহূর্তে এ জাতীয় গুরুত্বপূরর্ণ বিষয়ের বর্ণনা স্থগিত বা বিলম্ব করা জায়েয নয়; যা আমরা উসূলে হাদীস ও ফিক্বাহ শাস্ত্রে গৃহীত নীতিমালার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। অতএব এর দ্বারা মোজার উপরাংশ কর্তনের আদেশ রহিত হওয়া সাব্যস্ত হলো। যদি ওয়াজিব হতো তা হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই তা স্পষ্ট করে বলে দিতেন। আল্লাহ পাকই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত।

৩। মুহরিমের জন্য এমন ধরণের চামড়ার মোজা পরিধান করা জায়েয আছে যেগুলোর নালি পায়ের গোড়ালীর (টাখনুর) নিচে থাকে। কারণ, এগুলো জুতার শ্রেণীভুক্ত।

৪। মুহরিমের জন্য লুঙ্গী গিরা দেয়া কিংবা সুতা বা ঐ ধরণের কিছু দিয়ে তা বেঁধে রাখা জায়েয আছে। কেননা, এই ধরণের কাজ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে কোন দলীল নেই।

৫। মুহরিমের জন্য গোসল করা, মাথা ধৌত করা বা মাথা চুলকানোর প্রয়োজন হলে ধীরে ধীরে সহজভাবে চুলকানো জায়েয আছে। এই চুলকানোর কারণে মাথা থেকে কোন কিছু পড়ে গেলে তাতে কোন দোষ নেই।

ইহরাম অবস্থায় স্ত্রীলোকের পক্ষে আপন চেহারা আবৃত রাখার জন্য সেলাইকৃত কোন বস্ত্র যেমন, নেকাব, মুখাবরণ অথবা উভয় হাতের জন্য যেমনঃ হাত মোজা পরিধান করা জায়েয নয়।

কেননা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

«لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»

অর্থঃ "(ইহরাম অবস্থায়) স্ত্রীলোক মুখাবরণ পরিধান করবে না এবং হাত-মোজাও পরিধান করবে না।" (বুখারী)

কুফফায অর্থাৎ হাত-মোজা বলতে ঐ বস্ত্রকে বুঝানো হচ্ছে যা উভয় হাতের মাপে পশমী সুতা, তুলার সুতা অথবা অন্য কিছু দিয়ে সেলাই বা বোনা হয়ে থাকে।

৬। এছাড়া মেয়েলোকের জন্য সেলাই করা অন্যান্য বস্ত্র পরিধান করা জায়েয আছে। যেমনঃ কামীজ পায়জামা, চামড়ার মোজা সুতার মোজা ইত্যাদি।

৭। এভাবে মেয়েলোকের জন্য প্রয়োজন- বোধে চেহারার উপর বন্ধনী ছাড়া উড়না লটকানো জায়েয আছে। উড়না যদি স্ত্রীলোকের চেহারা স্পর্শ করে থাকে তজ্জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেছেনঃ

«كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُنَا كَشَفْنَاهُ»

অর্থঃ "আমাদের নিকট দিয়ে হজের কাফেলাসমূহ অতিক্রম

করছিল। আমরা তখন (বিদায় হজে) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। যখন কাফেলার লোকজন আমাদের বরাবর হয়ে অতিক্রম করতো তখন আমাদের মেয়েলোকেরা তাদের চাদর মাথা থেকে চেহারার উপর লটকিয়ে দিত। যখন তারা আমাদের অতিক্রম করে চলে যেত তখন আমরা তা উন্মোচন করে দিতাম।" (আবূ দাউদ, ইবনে মাযাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং দারাকুতনী উম্মে সালামা থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

এভাবে স্ত্রীলোক কর্তৃক তার উভয় হাত কাপড় বা অন্য কিছু দিয়ে আবৃত করত কোন আপত্তি নেই এবং পর পুরুষের উপস্থিতিতে স্ত্রীলোকের চেহারা ও উভয় হাত ঢেকে রাখা ওয়াজিব। কেননা, মেয়েলোক আওরাত অর্থাৎ ঢেকে রাখার বস্তু। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾

অর্থঃ "নারীগণ তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না তাদের স্বামী, তাদের পিতা-------------- ব্যতীত।" (সূরা নূরঃ ৩১)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, চেহারা ও হাতদ্বয় সৌন্দর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতীক এবং তন্মধ্যে চেহারা সর্বাধিক মারাত্মক ও গুরুতর।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেনঃ

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

অর্থঃ “আর যখন তোমরা তাঁদের (রাসূল পত্নীগণের) নিকট থেকে কোন সামগ্রী চাইবে তখন তা পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তর ও তাঁদের অন্তরের জন্য পবিত্রতম।” (সূরা আহযাবঃ ৫৩)

লক্ষণীয় বিষয়, অনেক মেয়েলোককে দেখা যায়, তারা ইহরাম অবস্থায় চেহারা থেকে ওড়না উপরে উঠিয়ে রাখার জন্য ওড়নার নিচে এক প্রকার বন্ধনী ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের জানা মতে, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। যদি এর কোন ভিত্তি থাকতো তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের জন্য তা স্পষ্ট করে বলে দিতেন। এব্যাপারে তিনি কোনক্রমেই নীরব থাকতেন না।

৮। মুহরিম পুরুষ বা নারী যে কাপড়ে ইহরাম বেঁধেছে সে কাপড় ময়লাযুক্ত বা অনুরূপ কিছু হলে তা ধৌত করা জায়েয আছে এবং তার জন্য এই কাপড় অন্য কাপড় দ্বারা পরিবর্তন করে নিলেও জায়েয হবে।

৯। মুহরিম লোকের জন্য এমন কোন কাপড় পরিধান করা জায়েয নয় যা জাফরান বা অরস দ্বারা রঙ্গীন হয়েছে। কেননা, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এই ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

১০। মুহরিমের জন্য অশ্লীলতা, শরীয়ত পরিপন্থী কথা ও কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বর্জন করা ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾

অর্থঃ “হজ অনুষ্ঠিত হয় সুবিদিত কয়েকটি মাসের মধ্যে। সুতরাং যে ব্যক্তির উপর এই মাসগুলোতে হজ পালন ফরয হয় সে যেন হজের সময়ে স্ত্রীসম্ভোগ, শরীয়ত-পরিপন্থী আচরণ ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকে।” (সূরা বাক্বারাঃ ১৯৭)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত অপর একটি সহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে, তিনি বলেছেনঃ

« مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ ، فَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ »

অর্থঃ “যে ব্যক্তি হজ পালন করে এবং স্ত্রীসম্ভোগ ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ-কর্ম করে না যে ঐদিনের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে ফিরে যাবে, যে দিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিল।

রাফাস শব্দের অর্থঃ স্ত্রী সম্ভোগ, অশ্লীল কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম।

ফুসূক শব্দের অর্থঃ গুনাহের কাজ বা অপরাধসমূহ।

জিদাল শব্দের অর্থঃ বাতিল অথবা অনর্থক কোন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা।

তবে সত্যের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের প্রতিরোধ ও উৎখাতের জন্য উত্তম পন্থায় তর্ক-যুদ্ধ বা বিবাদ করলে কোন দোষ নেই; বরং শরীয়তে একাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

অর্থঃ “(হে রাসূল), তুমি লোকদেরকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর, হিকমত ও উত্তম ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে। আর তাদের সাথে সদ্ভাব ও সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক কর।” (সূরা নাহলঃ ১২৫)

১১। পুরুষ মুহরিমের জন্য লেগে থাকা কোন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা হারাম। যেমনঃ টুপী, রুমাল পাগড়ী বা এই ধরণের কোন কাপড়। এভাবে মুহরিম ব্যক্তি তার চেহারাও ঢাকতে পারবে না। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফাতের দিনে সওয়ারীর উপর থেকে পড়ে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছিলেনঃ

« اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا »

অর্থঃ “তাকে পানি ও কুলপাতা দিয়ে গোসল দাও এবং তাকে তার পরিহিত কাপড় দু’খানা দিয়েই কাফন দাও। তার মাথা এবং চেহারা আবৃত করোনা, কেননা, তাকে ক্বিয়ামতের দিন তালবিয়াহ পাঠরত অবস্থায় পুনরুত্থান করা হবে।” (বুখারী ও মুসলিম, তবে শব্দগুলো মুসলিমের)

১২। তবে মুহরিম ব্যক্তির জন্য গাড়ির ছাদ, ছাতা বা এই ধরণের কোন কিছুর ছায়া গ্রহণে কোন দোষ নেই। যেমনঃ তাঁবু বা গাছের ছায়া। কেননা, সহীহ হাদীসে আছে যে, জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপের সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ছায়া দেয়া হয়েছিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আরো প্রমাণিত আছে যে, নামিরা উপত্যকায় আরাফার দিন তাঁর জন্য তাঁবু নির্মাণ করা হয়েছিল। তিনি তার নিচে অবতরণ করেন এবং

আরাফার দিন সূর্য হেলে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন।

১৩। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকের জন্য ইহরাম অবস্থায় কোন স্থলচর জন্তু শিকার করা, শিকারে সহযোগিতা করা বা জন্তুকে তার অবস্থানস্থল থেকে বিতাড়িত করা হারাম। এভাবে ইহরাম অবস্থায় বিবাহের আক্দ করা, সহবাস করা, স্ত্রীলোকের বিবাহের প্রস্তাব দেয়া অথবা কামপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে স্ত্রীলোকের সাথে জড়াজড়ি করা জায়েয নয়। এর প্রমাণ স্বরূপ উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

« لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ »

অর্থঃ "মুহরিম ব্যক্তি নিজে বিবাহ করবে না, অপরকে বিবাহ দিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও দিবে না।" (মুসলিম)

১৪। মুহরিম ব্যক্তি যদি ভুলবশতঃ অথবা অজ্ঞতার কারণে সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করে ফেলে অথবা মাথা ঢেকে রাখে অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে ফেলে, তাহলে সেজন্য তাকে কোন 'ফিদয়া' অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে যখনই বিষয়টি স্মরণ হবে অথবা জানতে পারবে তখনই তা সরিয়ে ফেলবে। এভাবে কেউ যদি ভুল বা অজ্ঞতাবশতঃ মাথা মুণ্ডন করে ফেলে অথবা চুলের অংশবিশেষ কেটে ফেলে অথবা তার নখ কেটে ফেলে, তাহলে বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

১৫। কোন মুসলমানের জন্য, পুরুষ হোক আর নারী হোক, ইহরাম অবস্থায় হোক অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় হোক সর্বাবস্থায় হারাম সীমার অভ্যন্তরে কোন জন্তু শিকার করা অথবা কোন অস্ত্র,

ইঙ্গিত ইত্যাদির দ্বারা শিকারে সহযোগিতা করা হারাম। এভাবে কোন শিকারযোগ্য জন্তুকে তার অবস্থান থেকে তাড়ানোও হারাম। হারাম সীমার অভ্যন্তরে গাছ কাটা বা তাজা ঘাস-তৃণাদি কাটা বা উৎপাটন করা, এমনকি পতিত কোন বস্তু কুড়ানোও হারাম, তবে সেই ব্যক্তির জন্য কুড়ানো জায়েয আছে যে তার মালিকের সন্ধান নিতে ইচ্ছা পোষণ করে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

« إن هـذا البلـد – يعنـي: مكـة – حـرام بحرمـة الله إلـى يـوم القيامـة لا يُعـضد شـجرها، ولا يُنفـر صـيدها، ولا يُختلـى خلاهـا، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد»

অর্থঃ "নিশ্চয়ই এই শহর অর্থাৎ মক্কা নগরী আল্লাহ পাক স্বীয় সম্মানে সম্মানিত করে রেখেছেন। এর গাছ কাটা যাবে না। শিকার করা যাবে না, এর ঘাস-তৃণাদি উৎপাটন করা যাবে না এবং তার মধ্যে পতিত কোন বস্তু কুড়ানো হালাল হবে না। মালিকের সন্ধান করার ইচ্ছা ব্যতিরেকে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত 'আল-মুনশিদ' শব্দের অর্থঃ পরিচয় দানকারী (অর্থাৎ পতিত বস্তুর মালিক সন্ধানকারী।)

'আল-খালা' শব্দের অর্থঃ তাজা ঘাস-তৃণাদি।

উল্লেখ্য যে, মীনা ও মুযদালিফা হারামের অন্তর্ভুক্ত, তবে আরাফা হারামের বাইরে 'হিল' এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

মক্কা শরীফে পৌঁছে হাজীদের জন্য যা করণীয়

মক্কায় পৌঁছার পর হারাম শরীফে প্রবেশের পূর্বে হাজীদের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা করেছিলেন। তারপর যখন মাসজিদে হারামের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবে তখন প্রবেশকালে সুন্নাত হলোঃ প্রথমে ডান পা রাখবে এবং এই দুয়া পড়বেঃ

«بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ».

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ, আউযূ বিল্লাহিল 'আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়া সুলত্বানিহিল ক্বাদীম মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। আল্লাহুম্মাফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থঃ "আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর। মহান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল মুখমণ্ডল ও তাঁর চিরন্তন কর্তৃত্বের আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত অভিশপ্ত শয়তান থেকে। হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও।"

এ দুয়া কেবল মাসজিদে হারামেই নয়, সকল মাসজিদে প্রবেশকালেই পড়বে। আমার জানা মতে, মাসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন দুয়া নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত নেই।

যখন বায়তুল্লাহ শরীফের নিকট পৌঁছবে তখন ত্বাওয়াফ শুরু করার পূর্বে তালবিয়াহ উচ্চারণ থেকে বিরত হয়ে যাবে, যদি উমরা অথবা তামাত্তু হজ পালনকারী হয়ে থাকে। অতঃপর হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) অভিমুখে অগ্রসর হয়ে এবং তার সম্মুখীন হয়ে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে। সহজসাধ্য হলে তাতে চুম্বন করবে। এজন্য ভীড় করে লোকদের কষ্ট দিবে না। হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় বলবেঃ

بسم الله والله أكبر

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহ ওয়া আল্লাহু আকবার।

অর্থঃ "আল্লাহর নামে শুরু করছি, আর আল্লাহই সর্ব মহান।"

চুম্বন দিতে কষ্ট হলে স্বীয় হাত, লাঠি বা এরূপ কিছুর দ্বারা তা স্পর্শ করবে এবং যা দিয়ে স্পর্শ করবে, তাতে চুম্বন দিবে। আর যদি কোন কিছুর দ্বারা স্পর্শ করা কষ্টকর হয়, তাহলে তার প্রতি ইশারা করে 'আল্লাহু আকবার' বলে ত্বাওয়াফ করতে থাকবে এবং যা দিয়ে ইশারা করবে তাতে চুম্বন দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ত্বাওয়াফ করার সময় বায়তুল্লাহ শরীফকে বাম পার্শ্বে রাখবে। ত্বাওয়াফের শুরুতে এই দুয়াটি পড়া উত্তম:

اللهم إيمانا بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ঈমানান বিকা, ওয়া তাসদীকান বিকিতাবিকা, ওয়া ওফা-আন বি'আহদিকা, ওয়া ইত্তেবাআন লিসুন্নাতি নাবিয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তোমার প্রতি বিশ্বাস রেখে, তোমার কিতাবের

প্রতি সত্যায়ন করে, তোমার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণার্থে এবং তোমার প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত অনুকরণের মাধ্যমে ত্বাওয়াফ শুরু করছি।

কেননা, এই দুয়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে।

সাত চক্রে ত্বাওয়াফ করবে। প্রথম ত্বাওয়াফের (ত্বাওয়াফে কুদুম)-এর প্রথম তিন চক্রের সম্পূর্ণটাই রমল করবে। এই রমল কেবল সেই ত্বাওয়াফেই করতে হয় যেটি উমরা পালনকারী, তামাত্তু' হজ পালনকারী, ইফরাদ হজ পালনকারী অথবা উমরা ও হজ একত্র করে ক্বিরান হজ পালনকারী সর্বপ্রথম মক্কায় আগমণের পর সম্পাদন করে থাকে। অপর চারটি চক্রে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলবে। প্রতিটি চক্র হাজারে আসওয়াদ থেকে শুরু করবে এবং এই হাজারে আসওয়াদে এসেই শেষ করবে।

রমল অর্থঃ ঘনঘন পদক্ষেপে দ্রুত হেঁটে চলা। শুধু এই প্রথম ত্বাওয়াফের প্রতিটি চক্রে ইজতেবা মুস্তাহাব। আর ইজতেবা হলোঃ চাদরের মধ্যমাংশ ডান কাঁধের নিচে অর্থাৎ বগলের মধ্যে রেখে তার উভয় কিনারা বাম কাঁধের উপর ফেলে রাখা।

ত্বাওয়াফের মধ্যে চক্রের সংখ্যার ব্যাপারে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় তাহলে নিশ্চিত সংখ্যা অর্থাৎ কম চক্র ধরে অবশিষ্ট চক্রগুলো শেষ করবে। যেমনঃ তিন না চার চক্র পূর্ণ হলো এব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে তিনচক্র ধরে নিতে হবে। সাফা-মাওয়ার মধ্যে সায়ী-এর ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিলে এভাবেই সমাধান করবে।

এই ত্বাওয়াফ সমাপ্ত করার পর ত্বাওয়াফ পরবর্তী দুই রাক আত নামায পড়ার পূর্বেই আপন চাদরখানা স্বাভাবিকভাবে পরিধান করে

নিবে অর্থাৎ চাদরখানা উভয় কাঁধের উপর দিয়ে তার উভয় কিনারা বুকের উপর ছেড়ে রাখবে।

নারীদের জন্য যে সব বিষয় প্রত্যাখ্যান করা ও যেগুলো থেকে তাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য সেগুলো হলোঃ সাজ-সজ্জা ও সুগন্ধি সহকারে ত্বাওয়াফ করা এবং নারী মূলত: পর্দারই অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পর্দা না করা। তাদের জন্য ত্বাওয়াফের অবস্থায় এবং অন্যান্য যেসব অবস্থায় পুরুষদের সাথে তাদের সংমিশ্রণ ঘটে, পর্দা করা এবং সাজ-সজ্জা পরিহার করা ওয়াজিব। কেননা, তারা মূলত:ই গোপনীয় সত্বা এবং পুরুষদের জন্য ফেতনার কারণ। স্ত্রীলোকের একান্ত নির্দিষ্ট পুরুষগণ (মাহরাম) মুখমণ্ডল তার সৌন্দর্যের সর্বাধিক আকর্ষণীয় অংশ। সুতরাং তার (মাহরাম) ব্যতীত অন্য কারো সম্মুখে তা প্রকাশ করা জায়েয নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾

অর্থঃ "মুসলিম নারীগণ তাদের সৌন্দর্য আপন স্বামীগণ ব্যতীত অন্য কারো সম্মুখে প্রকাশ করবে না।" (সূরা নূরঃ ৩১)

সুতরাং যখন কোন পরপুরুষ দেখতে পায় তখন মেয়েলোকের জন্য হাজারে আসওয়াদ চুম্বন দেয়ার সময় মুখ খোলা জায়েয হবে না। অনুরূপ যদি মেয়েলোকের জন্য হাজারে আসওয়াদ চুম্বন দেয়া বা স্পর্শ করা সহজসাধ্য না হয় তা হলে পুরুষদের সাথে ভীড় করাও জায়েয হবে না; বরং তারা পুরুষদের পিছনে ত্বাওয়াফ করবে। এটাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক এবং পুরুষদের সাথে ভীড় করে কা বা শরীফের নিকটবর্তী হয়ে ত্বাওয়াফ করার চেয়েও উত্তম।

প্রথমবারের এই ত্বাওয়াফ ব্যতীত অন্য কোন ত্বাওয়াফে 'রমল' ও 'ইজতেবা' শরীয়তসম্মত নয়; সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করার সময়ও রমল বা ইজতেবা নেই। মেয়েলোকের জন্য কোন প্রকার ত্বাওয়াফে রমল বা ইজতেবা করতে নেই। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় আগমনের সময় প্রথম ত্বাওয়াফ ব্যতীত অন্য কোন ত্বাওয়াফে রমল বা ইজতেবা করেননি।

ত্বাওয়াফকালে যাবতীয় নাপাকী ও নোংরা বিষয়াদি থেকে পবিত্র হয়ে আপন প্রভু- প্রতিপালকের প্রতি অবনত ও বিনীত হয়ে থাকবে। এভাবে ত্বাওয়াফ করার সময় অধিক মাত্রায় আল্লাহর জিকির ও দুয়ায় ব্যস্ত থাকা মুস্তাহাব। যদি ত্বাওয়াফকালে কুরআন মাজীদ থেকে কিছু তিলাওয়াত করে তাহলেও উত্তম। তবে এই ত্বাওয়াফ বা অন্যান্য ত্বাওয়াফে অথবা সায়ী করার সময় পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন জিকির বা দুয়া নেই।

কতিপয় লোক যে ত্বাওয়াফ বা সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ীর প্রতিটি চক্করে বিশেষ বিশেষ দুয়া ও জিকির নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই; বরং যে পরিমাণ জিকির ও দুয়া সহজসাধ্য হবে তা পড়াই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

যখন রুকনে ইয়ামানী-এর বরাবর পৌঁছবে তখন স্বীয় ডান হাত দ্বারা তা স্পর্শ করবে এবং বলবেঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার"। রুকনে ইয়ামানীতে চুম্বন দিবে না। যদি তা স্পর্শ করতে কষ্ট হয় তাহলে তা স্পর্শ না করে সম্মুখে চলে যাবে, তার প্রতি ইশারা করবে না বা তার বরাবর হলে তাকবীরও বলবে না। কেননা, আমাদের জানা মতে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এর কোন হাদীস পাওয়া যায়নি। রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে

আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে ত্বাওয়াফ কারীর জন্য নিম্নোক্ত দুয়াটি পড়া মুস্তাহাবঃ

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ “রাব্বানা আ-তিনা ফিদ দুনয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়াক্বিনা আজাবান-নার।”

অর্থঃ “হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।” (সূরা বাকারাঃ ২০১)

আর যখনই হাজারে আসওয়াদের বরাবর হবে তখনই তাকে স্পর্শ করবে, তাতে চুম্বন দিবে এবং ‘আল্লাহু আকবার বলবে। যদি তাকে স্পর্শ করা বা চুম্বন প্রদান সহজসাধ্য না হয়, তাহলে যখন তার বরাবর পৌঁছবে তখন হাত দ্বারা ইশারা করবে এবং আল্লাহু আকবার বলবে।

যমযম এবং মাক্বামে ইবরাহীমের পিছন দিয়েও ত্বাওয়াফ করলে কোন দোষ নেই। বিশেষ করে লোকের ভীড়ের সময়। মাসজিদে হারামের সব অংশই ত্বাওয়াফের স্থান, অতএব যদি হারামের গ্যালারী দিয়ে ত্বাওয়াফ করে তবুও তার ত্বাওয়াফ হয়ে যাবে। তবে সহজসাধ্য হলে কা’বা শরীফের অধিকতর নিকটবর্তী হয়ে ত্বাওয়াফ করা উত্তম।

ত্বাওয়াফ শেষে সহজসাধ্য হলে মাক্বামে ইমরাহীমের পিছনে দু রাক‘আত নামায পড়বে। যদি লোকের ভীড় বা অন্য কোন কারণে সেখানে নামায পড়তে সমর্থ না হয় তাহলে মাসজিদে হারামের যে

কোন স্থানে তা পড়ে নিতে পারে। এই নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার পর প্রথম রাক'আতে সূরা আল-কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পড়বে। এভাবে পড়া উত্তম। এগুলো ছাড়া অন্য যে কোন সূরা পড়লেও চলবে। নামাযের পর হাজারে আসওয়াদের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হবে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে তাতে ডান হাত দ্বারা স্পর্শ করবে, যদি তা সহজসাধ্য হয়।

অতঃপর বাবে সাফা হয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হবে। তার উপরে উঠবে অথবা তার পাদদেশে দাঁড়াবে। তবে সহজসাধ্য হলে তার উপরে ওঠা ভাল। সাফা পাহাড়ে পৌঁছে প্রথম চক্কর শুরু করার সময় এই আয়াত পাঠ করবেঃ

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ﴾

অর্থঃ "সাফা এবং মারওয়া মহান আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর অন্যতম। সুতরাং যে কেউ কা বা ঘরের হজ কিংবা উমরা আদায় করতে যায়, তার জন্য এ দু টি পাহাড়ের মধ্যে সায়ী করাতে কোন পাপ নেই এবং কেউ স্বতঃস্ফুর্তভাবে কোন সৎকার্য করলে আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই এর প্রতিফল দান করবেন এবং তিনি এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।" (সূরা বাকারাঃ ১৫৮)

অতঃপর মুস্তাহাব হলো, সাফা পাহাড়ের উপর কেবলামূখী হয়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন ও তাকবীর উচ্চারণ করবে এবং বলবেঃ

لا إله إلاّ الله، والله أكبر، لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله

إلاّ الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া দাহু, ওয়া নাসারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।"

অর্থঃ "আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, আর আল্লাহই সর্ব মহান। এক আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার আর কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, সর্বত্র তাঁরই রাজত্ব, যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য, তিনিই জীবিত করেন, তিনিই মৃত্যু দান করেন এবং তিনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। এক আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা বূদ নেই। তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই শত্রু দলগুলোকে পরাস্ত করেছেন।"

তারপর সেখানে হাত উঠিয়ে সাধ্যমত দুয়া করবে এবং এই জিকির ও দুয়া তিনবার করে পড়বে।

অতঃপর সাফা থেকে নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হবে। যখন প্রথম সবুজ চিহ্ন বরাবর পৌঁছবে তখন পুরুষ লোক দ্বিতীয় সবুজ চিহ্ন পর্যন্ত দ্রুত চলবে। মেয়েলোকের জন্য দ্রুত চলা বৈধ নয়। কেননা, তারা পর্দাও গোপনীয় স্বত্বার অন্তর্ভুক্ত এবং দ্রুত চলা পর্দার পরিপন্থী। তাদের জন্য সায়ীর সব কয়টি চক্করে স্বাভাবিকভাবে চলা শরীয়সম্মত। অতঃপর চলতে চলতে মারওয়া পাহাড়ে গিয়ে চড়বে অথবা তার পাদদেশে দাঁড়াবে। সহজসাধ্য হলে উপরে চড়া উত্তম। মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে তাই বলবে এবং করবে যা সাফা পাহড়ে ওঠে বলেছে ও করেছে। (তবে কুরআন শরীফের উক্ত আয়াতটি পড়বে না)

অতঃপর এই পাহাড় থেকে অবতরণ করে সাফা পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছবে; যেখানে হেঁটে চলার সেখানে হেঁটে চলবে এবং যেখানে দ্রুত চলার সেখানে দ্রুত চলবে। এভাবে সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাতবার সায়ী করবে। সাফা থেকে মারওয়ার দিকে যাওয়া এক চক্কর এবং মারওয়া থেকে সাফার দিকে প্রত্যাবর্তন আরেক চক্কর ধরা হবে। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখিত এই পদ্ধতিতে সায়ী করেছেন এবং তিনি বলেছেনঃ

«خُذُوا عَنِّى مَنَاسِككُمْ»

"আমার কাছ থেকে তোমরা হজের বিধি-বিধান শিখে নাও।"

এই সায়ীগুলোতে যথাসম্ভব বেশি বেশি করে দুয়া ও জিকির করা মুস্তাহাব। ছোট-বড় নাপাকী থেকে পাক পবিত্র হওয়া অর্থাৎ ওজু অবস্থায় হওয়া ভাল। তবে ওজু ছাড়াও সায়ী করলে আদায় হয়ে যাবে।

এভাবে কোন মেয়েলোক যদি বায়তুল্লাহ শরীফে ত্বাওয়াফ করার পর ঋতুবতী বা প্রসূতি হয়ে পড়ে তাহলে ঐ অবস্থায় সায়ী করলে তা আদায় হয়ে যাবে। কেননা, সায়ী-এর মধ্যে ওজু শর্ত নয়- যেমন পূর্বেও বলা হয়েছে ; বরং তা মুস্তাহাব।

অতঃপর যখন সায়ী সম্পন্ন হয়ে যাবে তখন পুরুষলোক মাথার চুল মুণ্ডাবে অথবা চতুর্দিক হতে সমান করে চুল ছোট করবে। তবে পুরুষের জন্য চুল মুণ্ডানই উত্তম। আর যদি চুল ছোট করে এবং মুণ্ডানোর কাজ হজের জন্য রেখে দেয় তাহলে ভালো। আর যদি হজের নিকটবর্তী সময়ে তাঁর মক্কায় আগমন হয়, তাহলে তার জন্য চুল ছোট করা উত্তম; যাতে হজের সময় সম্পূর্ণ মাথাটা মুণ্ডন করতে পারে।

কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ জিলহজ মাসের ৪ তারিখে যখন মক্কায় আগমন করেন তখন তিনি তাঁদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেন যে, যারা কুরবাণীর পশু চালিয়ে আসেনি তারা যেন উমরার পর মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যায়। তাঁদেরকে তিনি মাথা মুণ্ডানের নির্দেশ দেননি।

আর চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথা থেকে চুল ছোট করতে হবে। কিছু অংশ থেকে ছোট করলে চলবে না। যেমনভাবে মাথার কিছু অংশ মুণ্ডন করা চলে না।

স্ত্রীলোকের বেলায় চুল ছোট করাই শরীয়তসম্মত। তাদের চুল ছোট করার শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হলোঃ তারা চুলের প্রতিটি বেণীর অগ্রভাগ হতে এক আঙ্গুলের এক গিরা অথবা এর চেয়েও কিছু কম পরিমাণ চুল কর্তন করবে। আঙ্গুলের এক গিরা বলতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ বুঝানো হয়েছে। স্ত্রীলোক এর চেয়ে বেশি চুল কাটবেনা।

উপরে বর্ণিত কাজগুলো মুহরিম ব্যক্তি সম্পাদন করলে তার উমরা সমাপ্ত হয়ে যাবে। (আল-হামদু লিল্লাহ) তখন ইহরাম বাঁধার ফলে নিষিদ্ধ সকল কাজ তার জন্য হালাল হয়ে যায়। তবে, যে হাজী হাদী অর্থাৎ কুরবাণীর পশু চালিয়ে আসছে তাকে হজ ও উমরার উভয়টি সম্পূর্ণ করে হালাল হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় বহাল থাকতে হবে।

আর যে ব্যক্তি ইফরাদ হজের জন্য ইহরাম বেঁধেছে অথবা কিরান অর্থাৎ হজ ও উমরা উভয়টির নিয়তে ইহরাম বেঁধেছে, তার জন্য সুন্নাত হলোঃ সে উমরা শেষ করে ইহরাম খুলে ফেলবে এবং তামাত্তু হজ পালনকারী যা করবে সেও তা করবে। তবে যে ব্যক্তি কুরবাণীর জন্তু চালিয়ে আসছে সে ইহরাম অবস্থায়ই থাকবে। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবাগণকে ঐরূপ করতে

নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেনঃ

((لَوْلاَ أَنِّى سُقْتُ الْهَدْىَ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُم))

অর্থঃ "আমি যদি কুরবাণীর জন্তু চালিয়ে না আসতাম তা হলে আমি তোমাদের সাথে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যেতাম।"

কোন স্ত্রীলোক যদি উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবতী হয় অথবা তার সন্তান প্রসব হয় তাহলে সে কা'বা ঘরের ত্বাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ী করবে না। যখন সে ঋতুস্রাব বা প্রসবজনিত স্রাব থেকে পবিত্র হবে তখন ত্বাওয়াফ করবে, সায়ী করবে এবং মাথার চুল ছোট করবে। এরই মাধ্যমে তার উমরাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আর যদি ৮ই জিলহজ অর্থাৎ তারভিয়ার দিনের পূর্বে সেই স্ত্রীলোক পবিত্র না হয় তাহলে সে স্বীয় অবস্থানস্থল হতে ঐ তারিখে হজের জন্য ইহরাম বেঁধে লোকের সাথে মিনায় চলে যাবে এবং এভাবে সে হজ ও উমরা উভয়টি সম্পাদনের মাধ্যমে ক্বীরান হজ পালনকারিনী হয়ে যাবে এবং অন্য হাজী যা করবে সেই মেয়েলোকও তাই করবে। যেমনঃ আরাফাত ও মাশ আরে হারাম (মুজদালিফায়) অবস্থান, জামরাত সমূহে পাথর নিক্ষেপ, মুযদালিফা ও মিনায় রাত্রিযাপন, কুরবাণী করণ ও চুল কাটা ইত্যাদি। অতঃপর যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন কা বা ঘরের ত্বাওয়ফ করবে এবং সাফা-মারওয়ার সায়ী করবে। হজ ও উমরা উভয় ইবাদতের জন্য একবার ত্বাওয়াফ ও একবার সায়ী সম্পাদনই যথেষ্ট। এর প্রমাণ, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বর্ণিত হাদীস। তিনি বিদায় হজে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার পর ঋতুবতী হয়ে পড়েন। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেনঃ

((افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى))

অর্থঃ “হজের জন্য পুরুষ হাজী যা করবে তুমিও তা কর। তবে তুমি আল্লাহর ঘর ত্বাওয়াফ করবে না, যতক্ষণ না তুমি ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

আর যখন ঋতুবতী বা সন্তান প্রসবকারী স্ত্রীলোক কুরবাণীর দিন অর্থাৎ ১০ই জিলহজ পাথর নিক্ষেপ করে চুল ছোট করে নিবে তখন তার জন্য ঐসব বিষয় হালাল হয়ে যাবে যা ইহরাম বাঁধার কারণে হারাম হয়ে গিয়েছিল। যেমনঃ সুগন্ধি ইত্যাদি। তবে স্বামীর জন্য সে হালাল হবে না যতক্ষণ না অন্যান্য পবিত্র স্ত্রীলোকদের মত হজের কার্য সম্পূর্ণভাবে আদায় করে ফেলবে। সুতরাং যখন স্ত্রীলোক পবিত্র হওয়ার পর কা বা ঘরের ত্বাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ী সম্পন্ন করে ফেলবে তখন স্বামীর জন্য সে হালাল হয়ে যাবে।

যিলহজ মাসের ৮ তারিখে হজের জন্য ইহরাম বেঁধে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়ম

যখন তারভিয়ার দিন অর্থাৎ ৮ই যিলহাজ্জ সমাগত হবে তখন ইহরাম থেকে মুক্ত মক্কা অবস্থানরত বহিরাগত হাজীগণ এবং হজ পালনে ইচ্ছুক মক্কাবাসীগণ নিজ নিজ অবস্থানস্থল থেকেই হজের ইহরাম বেঁধে নিবে। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবাগণ বিদায় হজের সময় মক্কার 'আবতাহ' নামক স্থানে অবস্থান করেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশে তারভিয়ার দিন (৮ই যিলহাজ্জ) তাঁরা সেখান থেকেই হজের ইহরাম বাঁধেন। তিনি তাঁদেরকে বায়তুল্লাহর নিকট অথবা মীযাবের নিকট থেকে ইহরাম বেঁধে আসার কোন নির্দেশ প্রদান করেননি। এভাবে তিনি তাঁদেরকে মিনার দিকে যাত্রার প্রাক্কালে বিদায়ী ত্বাওয়াফ করারও কোন নির্দেশ দেননি। যদি এই কাজগুলো শরীয়তসম্মত হতো তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাগণকে এগুলো শিক্ষা দিতেন। বস্তুতঃ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাহাবাগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-এর অনুসরণের মধ্যেই সমূহ কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হজের জন্য ইহরাম বাঁধার সময় ঠিক সেইভাবে গোসল করা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব, যেভাবে মীক্বাতে ইহরাম বাঁধার সময় এগুলো করা হয়ে থাকে। হজের জন্য ইহরাম বাঁধার পর তারভিয়ার দিন অর্থাৎ ৮ই যিলহজ সূর্য ঢলার পূর্বে অথবা পরে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সুন্নাত। তখন থেকে ১০ই যিলহাজ্জ জামরাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ পর্যন্ত বেশি বেশি করে তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। মিনায় পৌঁছে

সেদিনের যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও পরের দিনের ফজরের নামায আদায় করবে। মিনায় অবস্থানকালে সুন্নাত হলোঃ সেখানে প্রত্যেক নামায তার নির্ধারিত সময়ে পড়বে। কোন দুই নামায একত্র করে পড়বে না। নামাযগুলো ক্বসর করে পড়বে, মাগরিব ও ফজর ব্যতিরেকে। কেননা এই দুই নামায ক্বসর করা হয় না।

এব্যাপারে মক্কাবাসী ও বহিরাগত অন্যান্য হাজীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিনা, আরাফা ও মুযদালিফায় মক্কাবাসী ও অন্যান্যদের নিয়ে ক্বসর করে নামায পড়েছেন। তিনি সেইসব স্থানে মক্কা- বাসীগণকে পূর্ণ নামায পড়তে বলেননি। যদি পূর্ণ নামায পড়া ওয়াজিব হতো তাহলে তিনি মক্কাবাসীদের তা স্পষ্ট করে বলে দিতেন।

আরাফাত গমন

আরাফার দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ সূর্যোদয়ের পর হাজীগণ মিনা থেকে আরাফার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। এক্ষেত্রে সুন্নাত হলোঃ আরাফাতের ময়দানে পৌঁছার পূর্বে নামিরা নামক স্থানে অবতরণ করে সূর্য ঢলা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা যদি তা সহজসাধ্য হয়। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা করেছিলেন।

অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়বে তখন ইমাম সাহেব অথবা তাঁর নায়েব জনগণের উদ্দেশ্যে সময়োপযোগী এক খুতবা প্রদান করবেন। তিনি এই খুতবায় ঐদিন এবং এর পরবর্তী হজের দিনগুলোতে হাজীদের জন্য শরীয়তসম্মত করণীয় কাজগুলো বর্ণনা করবেন। তিনি তাদেরকে এই খুতবায় আল্লাহকে ভয় করে চলার নসীহতসহ তাওহীদ সম্পর্কীয় বিষয়গুলো বিশেষভাবে বর্ণনা করবেন, প্রতিটি কাজ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে সম্পাদনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন এবং আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজসমূহ থেকে বিরত থাকার জন্য তাদেরকে সতর্ক করবেন। এই খুতবায় তিনি জনসাধারণকে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, যাবতীয় বিষয় এই কুরআন ও সুন্নাত মোতাবিক সম্পন্ন করা, সমুদয় কাজে এ দুটোকে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হিসেবে গ্রহণ করা এবং উপযুক্ত প্রতিটি বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্ণ অনুসরণ করে চলার অসীয়ত করবেন।

এই খুতবার পর হাজীগণ সেখানেই যোহর ও আসরের নামায ক্বসর করে একত্রে যোহরের সময় এক আযান ও পৃথক পৃথক দুই ইক্বামতের দ্বারা আদায় করবেন। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ করেছেন, যা ইমাম মুসলিম যাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেছেন।

আরাফাতে অবস্থান

আরাফাতের ময়দান সবটুকুই অবস্থান- যোগ্য। হাজীগণ আরাফাতের ময়দানে গিয়ে অবস্থান করবে 'উরানা' নামক উপত্যকা ব্যতীত। ('উরানা' আরাফাতের পশ্চিম পার্শ্বে একটি উপত্যকার নাম) সহজসাধ্য হলে 'জাবালে আরাফাকে সম্মুখে করে ও ক্বিবলামুখী হয়ে অবস্থান করা মুস্তাহাব। যদি 'জাবালে আরাফাত' এবং ক্বিবলা উভয়টিকে সম্মুখে রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে যেখানেই হোক শুধু ক্বিবলামুখী হয়ে অবস্থান করবে।

হাজীদের জন্য মুস্তাহাব হলো তারা যেন এই মহান অবস্থানে আল্লাহ পাকের জিকির এবং তাঁর কাছে দুয়া ও কাকুতি-মিনতি করার আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং দুয়ার সময় উপর দিকে হাত উঠিয়ে দুয়া করবে। এই সময় যদি তালবিয়া (অর্থাৎ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা----) পাঠ করে অথবা কুরআন শরীফ থেকে কিছু তিলাওয়াত করে তাহলে উত্তম হবে। এই অবস্থানে নিম্নোক্ত জিকিরটি অধিক মাত্রায় পাঠ করা সুন্নাত। জিকিরটি হলোঃ

لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ইয়ুহয়ি ওয়া ইয়ুমীতু, ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনিই

সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

কেননা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ "সর্বোত্তম দুয়া আরাফাতের দুয়া, আমিও আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের পঠিত উৎকৃষ্ট দুয়া হলোঃ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, লা-শারীকালাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, ইয়ুহয়ি ওয়া ইয়ূমীতু, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব তাঁরই এবং সকল প্রশংসা তাঁরই, তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনিই সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে, তিনি বলেছেনঃ

« أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ »

উচ্চারণঃ আহাব্বুল কালামি ইলাল্লাহি আরবাউন: সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদু লিল্লাহি, ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার।

অর্থঃ "আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য হলো চারটি। সেগুলো হলোঃ

১। সুবহানাল্লাহ (আল্লাহর পবিত্রতা জ্ঞাপন করি)।

২। আলহামদু লিল্লাহ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই)।

৩। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই)।

৪। ওয়াল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বাধিক মহান)।

অতএব, এই জিকির বেশি বেশি করে এবং বারবার অতি-বিনীত ও মনযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। এভাবে ঐ সমস্ত দুয়া ও জিকির যেগুলো শরীয়তসম্মত, তা প্রতিটি মুহূর্তে পাঠ করা উচিত। বিশেষ করে এই মর্যাদাপূর্ণ স্থানে ও এই মহান দিবসে। আর এজন্য হাজীগণ যেন ব্যাপক অর্থবোধক জিকির ও দুয়াসমূহ নির্বাচন করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

অর্থঃ প্রশংসাসহ আল্লাহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি সর্বদোষমুক্ত মহান ও মহীয়ান।"

﴿لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾

উচ্চরণঃ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমীন।

অর্থঃ "তুমি ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই তুমি পাক-পবিত্র। বস্তুতঃ আমিই ছিলাম অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।"

لا إله إلاّ الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل له الثناء الحسن، لا إله إلاّ الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া লা-না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু, লাহুন নি'মাতু ওয়া লাহুল ফাজলু, ওয়া লাহুস সানাউল হাসানু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসিনা লাহুদ্দীন, ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন।

অর্থঃ "আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, আমরা তাঁকে ছাড়া অপর কারো ইবাদত করি না, যত নিয়ামত ও অনুগ্রহরাশি রয়েছে সমস্তই তাঁরই প্রদত্ত, আর তাঁরই উত্তম প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, একমাত্র তাঁরই দ্বীনকে সম্পূর্ণ খালেস ও নির্ভেজাল করি, যদিও এটা কাফেরদের নিকট অপছন্দনীয়।"

لا حول ولا قوة إلا بالله.

উচ্চারণঃ লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অর্থঃ "কোন উপায় নেই এবং কোন ক্ষমতাও নেই আল্লাহ ছাড়া।"

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

উচ্চারণঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থঃ "হে আমাদের প্রভু! ইহকালে আমাদের কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর।" (সূরা বাকারাঃ ২০১)

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আসলিহ লী দ্বীনী, আল্লাজী হুয়া ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ লী দুনয়ায়া, আল্লাতী ফীহা মা'আশী; ওয়া

আসলিহ্ লী আখিরাতী, আল্লাতী ইলাইহা মা আদী; ওয়াজ 'আলিল হায়াতা যিয়াদাতান লী ফী কুল্লি খায়রিন, ওয়াজ 'আলিল মাউতা রাহাতান লী মিন কুল্লি শাররিন।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ করে দাও, যার মধ্যে রয়েছে আমার সমুদয় কার্যাদি সংরক্ষণের নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করে দাও আমার পার্থিব জীবনকে, যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা। আর আমার আখিরাতকে তুমি করে দাও বিশুদ্ধ, যেখানে আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমার জীবনকে অধিকতর মঙ্গল কাজের জন্য দীর্ঘ করে দাও। আর আমার মৃত্যুকে প্রত্যেক অনিষ্ট হতে আমার জন্য শান্তির উপায় করে দাও।"

أعوذ بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

উচ্চারণঃ আউজু বিল্লাহি মিন জাহিদল বালা-ই, ওয়া দারকিশ শাক্বা-ই, ওয়া সু-ইল ক্বাজা-ই, ওয়া শামাতাতিল আ'দা-ই।

অর্থঃ "আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি বালা-মুসিবতের ভয়াবহতা ও দুর্ভাগ্যের চরম অবস্থা হতে ও অদৃষ্টের মন্দ এবং দুশমনের হাসি-মস্করা হতে।"

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيئ السقام.

উচ্চারণঃ "আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল

হুযনে, ওয়া আউজু বিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসলি, ওয়া মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি, ওয়া মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরামি, ওয়া মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া ক্বাহরির রিজাল; আউজু বিকা আল্লাহুম্মা মিনাল বারাসে ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুযামি ওয়া মিন সাইয়িইল আসক্বামি।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি চিন্তা ও উদ্বেগ, অক্ষমতা ও অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, গুনাহ-খাতা, ঋণের গুরুভার এবং পরাজয়ের গ্লানি হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুষ্ঠরোগ, পাগলামী ও পাইলস এবং জটিল দূরারোগ্য ব্যাধিসমূহ হতে।"

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা আল'আফওয়া ওয়াল 'আফিয়াতা ফিদ্ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি।"

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছি।"

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দ্বীনি ওয়াদুনয়ায়া ওয়া আহলি ওয়া মালী।

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা এবং আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিবার ও ধনসম্পদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।"

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك

أن أغتال من تحتي.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতী, ওয়া আমিন রাওয়াতী, ওয়াহফাজনী মিন বাইনি ইয়াদাইয়া, ওয়া মিন খালফী, ওয়া 'আনয়ামীনী ওয়া আন শিমালী, ওয়া আন ফাউক্বী, ওয়া আউজু বি'আজামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমার গোপন দোষসমূহ ঢেকে রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি হতে নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! আমার অগ্র-পশ্চাৎ, ডান-বাম এবং উর্ধ্ব হতে (আপতিত বিপদ থেকে) আমাকে তুমি নিরাপদ রাখ। আমি পায়ের তলা হতে মাটি ধ্বসে যাওয়ার ফলে মৃত্যুবরণ হতে তোমার মহত্বের উসীলায় আশ্রয় চাচ্ছি।"

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني.

উচ্চারণঃ "আল্লাহুম্মাগফিরলী খাতীআতী, ওয়া জাহলী, ওয়া ইসরাফী ফী আমরী, ওয়ামা আন্তা আ লামু বিহি মিন্নী।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তুমি মাফ করে দাও আমার গুনাহ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অজ্ঞতা, কাজ কর্মে আমার সীমালঙ্ঘন এবং আমার তরফ হতে সংঘটিত সেই সব অপরাধ যার সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে অধিক অবহিত রয়েছ।"

اللهم اغفر لي جِدِّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী জিদ্দী, ওয়া হাজলী, ওয়া খাতায়ী, ওয়া আমাদী, ওয়া কুল্লা জা-লিকা ইন্দী।"

অর্থঃ “হে আল্লাহ! মাফ করে দাও তুমি আমার দ্বারা সংঘটিত প্রকৃত অপরাধ, আমার হাসি-তামাশায় কৃত পাপ, আমার ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আমার তরফ হতে কৃত সমস্ত পাপাচার।”

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু, ওয়া মাআখখারতু ওয়ামা আসরারতু, ওয়া মা আ'লানতু, ওয়া মা আন্তা আ'লামু বিহি মিন্নী; আনতাল মুক্বাদ্দিম, ওয়া আনতাল মুআখখিরু, ওয়া আন্তা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।”

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি যে সব গুনাহ অতীতে করেছি এবং যা পরে করেছি তার সমস্তই তুমি মাফ করে দাও, মাফ করো সেই গুনাহগুলোও যা আমি গোপনে করেছি, আর যা আমি প্রকাশ্যে করেছি, মাফ করো আমার সীমালঙ্ঘন জনিত গুনাহসমূহ এবং সেই সব গুনাহ যেগুলো সম্বন্ধে তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। তুমি যা চাও আগে কর এবং তুমি যা চাও পিছে কর। তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।” (বুখারী ও মুসলিম উভয়ই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلباً سليماً ولساناً صادقاً، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাস সাবাত ফীল আমরি, ওয়াল 'আযীমাতা আলার রুশদি, ওয়া আসআলুকা শুকরা নি মাতিকা, ওয়া হুসনা ইবাদাতিকা, ওয়া আসআলুকা ক্বালবান সালীমান ওয়া লিসানান সাদিকান, ওয়া আসআলুকা মিন খায়রি মা তা লামু, ওয়া আউজু বিকা মিন শাররি মা তা'লামু, ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা তা'লামু, ওয়া ইন্নাকা আল্লামুল গুয়ূব।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ধর্ম-কর্মে অনড় অবিচলতা, সৎপথে দৃঢ় নিষ্ঠা, তোমার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তোমার ইবাদতকে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে সম্পাদন করার তাওফীক্ব প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি নির্ভেজাল ও প্রশান্ত হৃদয় এবং সত্য নিষ্ঠ রসনা জবান। আমি সেই মঙ্গলের প্রার্থনা জানাই যা তুমি আমার জন্য ভাল মনে কর। আর তোমার নিকট আশ্রয় চাই সেই অমঙ্গল হতে যে সম্পর্কে তুমি অবগত। আর আমি ক্ষমা চাই সেই অন্যায় অপকর্ম হতে যা একমাত্র তুমিই জান। নিশ্চয়ই তুমি অদৃশ্য সম্পর্কে সর্বজ্ঞাত।"

اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي، واذهب غيظ قلبي وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বান নাবিইয়ি মুহাম্মাদিন 'আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামু, ইগফির লী জাম্বী, ওয়া আযহিব গায়জা ক্বালবী, ওয়া আয়িজনী মিন মুজিল্লাতিল ফিতানি মা আবক্বাইতানী।"

অর্থঃ "হে আল্লাহ! নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রভু প্রতিপালক। মাফ করে দাও আমার সমুদয় গুনাহ। আমার হৃদয়ের ক্রোধসমূহ দূর করে দাও, আর আমাকে যতদিন জীবিত রাখবে ততদিন ফেৎনা ও গুমরাহী থেকে বাঁচিয়ে রাখ।"

اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدَّين وأغنني من الفقر

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরযি, ওয়া রাববাল আরশিল 'আযীম, রাববানা ওয়া রাববা কুল্লি শাইয়িন, ফা-লিকাল হাববি ওয়ান নাওয়া, ওয়া মুনাযযিলাত তাওরাতি ওয়াল ইঞ্জিলি ওয়াল কুরআনে, আউযু বিকা মিন শাররি কুল্লি শাইয়িন আনতা আ-খিজুন বি না-সিয়াতিহি, আনতাল আউয়ালু ফা লাইসা ক্বাবলাকা শাইউন, ওয়া আনতাল আ-খিরু ফা লাইসা বা'দাকা শাইউন, ওয়া আনতাজ জা-হিরু ফা লাইসা ফাওক্বাকা শাইউন, ওয়া আনতাল বা-তিনু ফা লাইসা দুনাকা শাইউন, ইক্বজি আন্নীদ দাইনা ওয়া আগনিনী মিনাল ফাক্বরি।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তুমি আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, মহান আরশের প্রভু এবং আমাদেরও প্রত্যেক বস্তুর প্রভু। হে আল্লাহ! বীজ ও আঁটি চিরে চারা ও বৃক্ষ চারার উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনের অবতীর্ণকারী তুমি! আমি প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হতে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থণা করি, তোমার হাতে রয়েছে যার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ। হে আল্লাহ! তুমি অনাদি, তোমার পূর্বে কোন কিছুই

ছিল না; তুমি অনন্ত, তোমার পরে কোন কিছুই থাকবেনা, তুমি প্রকাশমান, তোমার উপরে কিছুই নেই, তুমি অপ্রকাশ্য, অথচ তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই। প্রভু! তুমি আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে দারিদ্রতা থেকে মুক্ত রাখ। (ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

اللهم أعط نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ তি নাফসী তাক্বওয়াহা, ওয়া যাক্কিহা, আনতা খায়রু মান যাককা হা, আনতা ওয়ালিইয়ূহা ওয়া মাওলা-হা।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমার অন্তরে আল্লাহ-ভীতি প্রদান কর এবং একে পবিত্র করে দাও। তুমিই এর সর্বোত্তম পবিত্রকারী এবং তুমিই এর অভিভাবক ও প্রভু-প্রতিপালক।

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালি ওয়া আউযু বিকা মিনাল জুবনি ওয়াল হারামি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল কাবর।

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা ও অলসতা, কৃপণতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য হতে তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব হতে।"

اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تُضلني، لا إله إلاّ أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খা-সামতু, আউযু বি ইজ্জাতিকা আন তাজিল্লানী, লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আল-হাইয়ূল লাজী লা ইয়ামু-তু ওয়াল জিননু ওয়াল ইনসু ইয়ামু-তু-ন।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমারই আনুগত্য বরণ করছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকেই প্রত্যাবর্তন করেছি, আর তোমারই সাহায্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছি। আমাকে পথভ্রষ্ট করার দুর্ভাগ্য হতে তোমার ইযযতের উসীলায় তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি। তুমি ভিন্ন সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তুমি চিরঞ্জীব যার কখনও মৃত্যু নেই। পক্ষান্তরে সমুদয় জিন ও মানবকুল মরণশীল।"

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন ইলমিন লা-ইয়ানফা' ওয়া মিন ক্বালবিন লা-ইয়াখশা' ওয়া মিন নাফসিন লা তাশ্বা' ওয়া মিন দা'ওয়াতিন লা-য়ূসতাজা-বু লাহা।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এমন ইলেম হতে, যা কোন উপকারে আসে না, এমন হৃদয় হতে যা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না, এমন অন্তর হতে যা কোন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং এমন দুয়া হতে যা কবূল হয় না।"

اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা জান্নিবনি মুনকারাতিল আখলা-কি ওয়াল

আ মালি ওয়াল আহওয়া-ই ওয়াল আদওয়া-ই।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দূরে রাখ যাবতীয় কুস্বভাব ও অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে এবং কুপ্রবৃত্তির তাড়না ও শারীরিক ব্যাধিসমূহ থেকে।"

اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আলহিমনি রুশদী ওয়া ইজনী মিন শাররি নাফসী।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমাকে আমার সুপথের সন্ধান দান কর এবং আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় দান কর।"

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাকিফনী বিহালা-লিকা 'আন হারামিকা, ওয়া আগনিনী বিফাযিলকা আম্মান সিওয়াকা।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! তোমার নিষিদ্ধ বস্তু হতে দূরে রেখে আমাকে তোমার হালাল বস্তুর মাধ্যমে অভাবমুক্ত রাখ, আর তুমি ব্যতীত অন্য সবকিছু হতে আমাকে তোমার অনুগ্রহরাশি দ্বারা অমুখাপেক্ষী করে দাও।"

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুক্বা, ওয়াল 'আফাফা ওয়াল গিনা।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই হিদায়াত, সংযম, পবিত্র স্বভাব এবং অভাবশূন্যতার।"

اللهم إني أسألك الهدى والسداد.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াস সাদাদা।

অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি হিদায়াত এবং সঠিক পথে চলার তাওফীকের।”

اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খায়রি কুল্লিহি আজিলিহি ওয়া আজিলিহি মা ‘আলিমতু মিনহু ওয়া মা-লাম আ লাম, ওয়া আউযু বিকা মিনাশশাররি কুল্লিহি ‘আজিলিহি ওয়া আ-জিলিহি মা ‘আলিমতু মিনহু ওয়া মা-লাম আ’লাম; ওয়া আসআলুকা মিন খায়রি মা সাআলাকা মিনহু ‘আব্দুকা ওয়া নাবিইয়ুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররি মাস্তা’আজা মিনহু ‘আব্দুকা ওয়া নাবিইয়ুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, নিকটবর্তী ও দূরবর্তী কল্যাণ যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে আমি অবিহিত নই। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সর্বপ্রকার অনিষ্ট হতে যা সন্নিকটে এবং যা দূরে অবস্থিত যে বিষয়ে আমি অবহিত এবং যে বিষয়ে আমি অনবহিত। আর আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণের আকাক্সক্ষী যার প্রার্থনা জানিয়েছেন তোমার বান্দাহ এবং তোমার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আর আমি সেই অকল্যাণ হতে তোমার নিকট আশ্রয়

প্রার্থনা করছি যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন তোমার প্রিয় বান্দাহ ও নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।”

اللهم إني أسألك الجنة وما قرَّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرَّب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়ামা ক্বাররাবা ইলাইহি মিন ক্বাওলিন আও ‘আমালিন, ওয়া আউজু বিকা মিনান নারি ওয়ামা ক্বাররাবা ইলাইহি মিন ক্বাওলিন আও ‘আমালিন, ওয়া আসআলুকা আন তাজ‘আলা কুল্লা ক্বাজা-ইন ক্বাজাইতাহু লী খায়রান।

অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই জান্নাতের এবং এমন কথা ও সৎকাজের জন্য যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয়। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি জাহান্নামের আগুন হতে এবং এমন কথা ও কাজ হতে যা আমাকে তার নিকটে নিয়ে যায়। আমার জন্য তুমি যা নির্ধারিত করে রেখেছ সেই নির্ধারিত বস্তুকে আমার নিমিত্ত মঙ্গলময় করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই।”

لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু বিয়াদিহিল খায়রু, ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; সুবহানাল্লাহি, ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল ‘আলিইয়িল আজীম।

অর্থঃ "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন শরীক নেই, সমগ্র রাজত্ব তাঁরই ও যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন, আর তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করি এবং সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ মহান। মহান উর্দ্ধতন আল্লাহ ছাড়া কারো কোন শক্তি বা সামর্থ নেই।

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আ-লি মুহাম্মাদিন, কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আ-লি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ; আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন ওয়ালা আ-লি মুহাম্মাদিন, কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আ-লি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ "হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ কর মুহম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বশংধরগণের প্রতি যেমন তুমি শান্তি বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর বংশধরগণের প্রতি, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর এবং তাঁর বংশধর গণের উপর, যেমন বরকত নাযিল করেছিলে তুমি ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-এর উপর এবং তাঁর

বংশধরগণের উপর, নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত মর্যাদা সম্পন্ন।

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.

উচ্চারণঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদদুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযাবান-নার।

অর্থঃ "হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে এই দুনিয়ায় কল্যাণ দান কর এবং কল্যাণ দান কর পারলৌকিক জীবনে এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা কর।"

হাজীদের জন্য এই মহান মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে পূর্বের দুয়া ও জিকিরগুলোসহ এই অর্থের অন্যান্য দুয়া, জিকির ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ বার বার পাঠ করা মুস্তাহাব। এই দুয়াগুলি পাঠ করার সময় কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাইতে থাকবে। জ্ঞতব্য যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দুয়া করতেন তখন তিনি প্রতিটি দুয়া তিনবার করে উচ্চারণ করতেন। সুতরাং এই ব্যাপারে তাঁরই অনুকরণ করা আমাদের উচিত।

আরাফাতের এই অবস্থানকালে আপন প্রতিপালকের নিকট অত্যন্ত দীনহীন, বিনীত ও ভগ্নসত্ত্বা হয়ে নিজেকে পেশ করবে। আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের আশা করবে এবং তাঁর আজাব ও অসন্তুষ্টির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। নিজের নফসের হিসাব-নিকাশ করবে এবং আন্তরিকতার সাথে নূতনভাবে তাওবা করবে। কেননা, এই দিন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ দিন এবং এক মহা সমাবেশ। আল্লাহপাক এই দিনে তাঁর বান্দাগণের জন্য দানের ভাণ্ডার খুলে দেন, তিনি তাঁর ফেরেশতাদের নিকট এই বান্দাদেরকে দেখিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন। এই দিবসে আল্লাহপাক বহু সংখ্যক লোককে

জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। বদরযুদ্ধের দিন ছাড়া শয়তানকে এই আরাফার দিনে যত লাঞ্ছিত, হীন, নিকৃষ্ট ও ম্লান দেখা যায় আর কোন দিন তাকে ঐরূপ দেখা যায় না। তা এই জন্য যে, শয়তান দেখতে পায়, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি অকাতরে দান ও ইহসান বিতরণ করে চলেছেন, বিপুলহারে লোক জাহান্নাম থেকে মুক্ত করছেন এবং মাগফিরাত দান করছেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

« مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ »

উচ্চারণ: মা মিন ইয়াওমিন আকসারা মিন আন ইউতিকাল্লাহু ফীহি আবদান মিনান নারি মিন ইয়াওমি আরাফাতা, ইন্নাহু লাইয়াদনু ছুম্মা ইউবাহী বিহিমুল মালাইকাতা, ফায়াকুলু মা-আরাদা হা-উলায়ী।

অর্থ: "এমন কোন দিন নেই যে সেদিন আল্লাহ পাক আরাফাতের দিন অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় স্বীয় বান্দাদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত করেন এবং সেদিন তিনি বান্দাদের অতি নিকটবর্তী হন। তারপর তিনি বান্দাদের উল্লেখ করে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব প্রকাশ করে বলেন: আমার এই বান্দাগণ কি চায়?"

অতএব মুসলমাদের উচিত, তারা যেন নিজেদের পক্ষ হতে আল্লাহ তায়ালাকে উত্তম কার্যাবলী দেখায় এবং বেশি বেশি যিকির-আযকার, দুয়া দরূদ পাঠ এবং সর্বপ্রকার পাপ ও ভুল-ত্রুটি থেকে তাওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে তাদের শত্রু শয়তানকে অপদস্ত ও

উদ্বিগ্ন করে তোলে। হাজীগণ সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের এই মহান সমাবেশে যিকির, দুয়া-দরূদ পড়া ও আল্লাহর নিকট অনুনয়-বিনয় অব্যাহত রাখবে।

সূর্যাস্তের পর হাজীগণ প্রশান্ত ও স্থির চিত্তে এবং ধীর গতিতে আরাফাত হতে মুযদালিফার দিকে যাত্রা শুরু করবে। পথিমধ্যে বেশি করে 'তালবিয়া' পাঠ করবে এবং প্রশস্ত রাস্তা পেলে সেখান দিয়ে দ্রুত আগাবে। কেননা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ করেছেন। কোন হাজীর জন্য আরাফাত থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রস্থান করা জায়েয হবে না। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূর্যাস্ত পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেছেন এবং তিনি বলেছেন:

« لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِكَكُمْ »

অর্থঃ "তোমরা আমার নিকট হতে হজের নিয়ম-কানূন শিখে নাও।"

মুযদালিফায় পৌঁছে

হাজীগণ সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে মাগরিবের তিন রাক আত ও এ'শার দুই রাক আত নামায একত্রিত করে এক আযান ও দুই ইক্বামতের দ্বারা আদায় করে নিবে। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেখানে পৌঁছে এরূপই করেছেন। তারা মুযদালিফায় মাগরিবের সময় অথবা এ শার সময় যখনই পৌঁছুক এভাবে নামায পড়বে।

কোন কোন লোক মুযদালিফায় পৌঁছার সাথে সাথে নামায পড়ার

পূর্বেই কঙ্কর সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের অনেকেই বিশ্বাস করে যে, এটি শরীয়তসম্মত কাজ। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা ভুল, শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। নবী করীম ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'মাশ'আরে হারাম' (মুযদালিফার যে স্থানে বর্তমানে বড় মসজিদ নির্মিত হয়েছে) থেকে মিনার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করার পরই কঙ্কর সংগ্রহের নিদের্শ দিয়েছিলেন। যে কোন স্থান থেকে কঙ্কর সংগ্রহ করলেই চলবে। নির্দিষ্ট করে মুযদালিফা থেকেই কঙ্কর সংগ্রহ করতে হবে এটা ঠিক নয়; বরং মিনা থেকেও সেগুলো সংগ্রহ করা জায়েয আছে।

সুন্নাত হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে জামরাতুর আক্বাবায় নিক্ষেপের জন্য ঐদিন সাতটি কঙ্কর সংগ্রহ করা। পরবর্তী তিন দিন মিনা হতেই প্রতি দিন ২১টি করে কঙ্কর সংগ্রহ করবে এবং সেগুলো পর্যায়ক্রমে তিন জামরায় নিক্ষেপ করবে।

কঙ্কর ধৌত করা মুস্তাহাব নয়; বরং সেগুলো না ধুয়েই নিক্ষেপ করতে হবে। কেননা, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা তাঁর সাহাবাগণ থেকে কঙ্কর ধৌতকরণের কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি। আর যে কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয়েছে পুনরায় সেটা জামরায় নিক্ষেপ করা যাবে না।

হাজীগণ এই রাতে মুযদালিফায় অবস্থান করবে। দুর্বল নারী, শিশু ও অনুরূপ লোকদের বেলায় শেষ রাতে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা জায়েয আছে। আয়েশা, উম্মে সালামা ও অন্যান্যদের হতে বর্ণিত হাদীসগুলো এর প্রমাণ। তাঁদের ছাড়া অপর হাজীগণের ক্ষেত্রে হুকুম হলো, তারা মুযদালিফায় ফজরের নামায পড়া পর্যন্ত অবস্থান নিশ্চিত করবে। ফজরের নামাযের পর তারা 'মাশ'আরুল হারাম'

(যেখানে বর্তমানে বড় মসজিদ অবস্থিত) যাবে এবং সেখানে তারা ক্বিবলামুখী হয়ে ভোরের আলো অনেকটা উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত বেশি বেশি করে আল্লাহর যিকির, তাকবীর ও দুয়ায় মশগুল থাকবে। সেখানে দুয়া করার সময় হাত উঠানো মুস্তাহাব। মুযদালিফায় যে কোন স্থানে অবস্থান করলেই চলবে। 'মাশ'আরুল হারাম' এর নিকটবর্তী হওয়া অথবা তার উপরে আরোহণ করা ওয়াজিব নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

« وَوَقَفْتُ هَا هُنَا - يعني على المشعر - وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ »

অর্থ: "আমি এখানে অর্থাৎ মাশআরুল হারামে অবস্থান করলাম, তবে পুরো মুযদালিফায় অবস্থানযোগ্য। (মুসলিম)

১০ই যিলহজ মিনায় গমন এবং করণীয় বিষয়ের বর্ণনা

যখন পূর্বাকাশে ভোরের আলোতে বেশ ফর্সা হয়ে উঠবে তখন সূর্যোদয়ের পূর্বে হাজীগণ মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে এবং পথে খুব বেশি বেশি করে (লাব্বাইকা) তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। পথিমধ্যে তারা যখন 'মুহাসসার' নামক উপত্যকায় পৌঁছবে তখন সেখানে কিছুটা দ্রুত চলা মুস্তাহাব।

যখন মিনায় পৌঁছবে তখন জামরাতুল আক্বাবার নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ করে দিবে। তারা সেখানে পৌঁছেই জামরাতুল আক্বাবায় পর পর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হাত উঠাবে এবং তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করবে। মুস্তাহাব হলো, কা'বা শরীফ বাম দিকে এবং মিনাকে ডান দিকে রেখে উপত্যকার দিক থেকে জামরাতুল আক্বাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। কারণ., রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপই করেছেন। তবে অন্য কোন দিক হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করলেও আদায় হয়ে যাবে, যদি কঙ্করগুলো লক্ষ্য স্থলে পতিত হয়। কঙ্করগুলো লক্ষ্যস্থলে পতিত হয়ে অবশিষ্ট থাকা শর্ত নয়; বরং সেখানে পতিত হওয়া শর্ত। যদি কঙ্কর লক্ষ্য স্থলে পতিত হয়ে তার বাইরে চলে যায়, তা হলেও চলবে। বিজ্ঞ আলেমগণের বাহ্যিক কথায় তাই প্রমাণিত হয়। যারা এই সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলেছেন, তাদের মধ্যে ইমাম নববী (রহঃ) অন্যতম। তিনি 'শরহুল মুহাযযাব' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। জামরায় নিক্ষেপের কঙ্করগুলো যেন ছোলা বা মটরশুটির চেয়ে একটু বড় হয়।

অতঃপর কঙ্কর নিক্ষেপের পর হাজীগণ নিজ নিজ হাদী অর্থাৎ কুরবানীর পশু যবেহ করবে। যবেহ করার সময় এই দুয়া পড়া মুস্তাহাব:

((بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك))

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহুম্মা হা-জা মিনকা ওয়া লাকা।

অর্থ: "আমি আল্লাহর নামে যবেহ করছি এবং আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ, এটি তোমারই নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।"

যবেহ করার সময় পশুটি ক্বিবলামুখী করবে। যবেহ করার সময় সুন্নাত হলো: উটের সামনের বাম দিকে দাঁড়ানো ও বাঁধা অবস্থায় তার বক্ষদেশ কুপাঘাত করা এবং গরু বা ছাগল বাম কাতে শায়িত করে যবেহ করা। কেউ যদি কুরবানীর পশু ক্বিবলামুখী না করে যবেহ করে ফেলে তা হলে এতে সুন্নাত ত্যাগ করা হয়, তবে যবেহ

সিদ্ধ হবে। কেননা, পশু যবেহ করার সময় তাকে ক্বিবলামুখী করা সুন্নাত, তবে ওয়াজিব নয়।

কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া, অপরকে হাদিয়া দেয়া ও সাদকা করা মুস্তাহাব। কেননা আল্লাহ পাক বলেন:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

অর্থঃ "সুতরাং তোমরা কুরবানীর যবেহ থেকে খাও এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের খাওয়াও।" (সূরা হজ: ২৮)

বিজ্ঞ আলেমগণের অধিকতর বিশুদ্ধ মতে কোরবানীর সময়সীমা আইয়ামে তাশরীকের তৃতীয় দিবস অর্থাৎ ১৩ই যিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত। সুতরাং কুরবানীর সময় হলো: কোরবানীর দিন এবং পরবর্তী আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন, মোট চার দিন।

কুরবানীর পশু নহর বা যবেহ করার পর হাজী তার মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করবে। তবে চুল মুণ্ডন করা উত্তম। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুল মুণ্ডনকারীদের জন্য রহমত ও মাগফিরাতের জন্য তিনবার দুয়া করেছেন। আর যারা চুল ছোট করেছে, তাদের জন্য মাত্র একবার সেই দুয়া করেছেন। মাথার কিছু অংশের চুল ছোট করা যথেষ্ট হবে না; বরং মুণ্ডন করার মত সমস্ত মাথা থেকে চুল ছোট করতে হবে। আর স্ত্রীলোক তার চুলের প্রত্যেক বেণীর শেষাংশ হতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ বা এর চেয়েও কম পরিমাণ চুল ছোট করবে।

জামরাতুল আক্বাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ এবং মাথার চুল মুণ্ডন বা চুল ছোট করার পর মুহরিম হাজীর জন্য স্ত্রী ব্যতীত অন্য সবকিছু হালাল হয়ে যাবে, যা ইহরামের কারণে তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছিল। এই হালাল হওয়াকে 'প্রথম হালাল' বলা হয়ে থাকে। এই হালাল

হওয়ার পর হাজীর জন্য খুশবু ব্যবহার এবং ত্বাওয়াফে ইফাজা সম্পাদনের জন্য মক্কা শরীফের দিকে যাত্রা করা সুন্নাত। এর প্রমাণ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর বর্ণিত সহীহ হাদীস। তিনি বলেন:

« كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ »

অর্থ: "আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ইহরামের জন্য ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে এবং হালাল হওয়ার পর বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করার পূর্বে খুশবু মাখাতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

এই ত্বাওয়াফ 'ত্বাওয়াফ ইফাজা' এবং 'ত্বাওয়াফে যিয়ারাহ উভয় নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। এই ত্বাওয়াফ হজের অন্যতম রুকন, এটা ব্যতীত হজ সম্পন্ন হয় না। এই ত্বাওয়াফের কথাই আল্লাহ পাক তাঁর এই বাণীতে উদ্দেশ্য করেছেন:

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]

অর্থ: "এরপর তারা যেন তাদের শারিরিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং অর্থাৎ সুপ্রাচীন কা'বাগৃহের ত্বাওয়াফ সম্পন্ন করে।" (সূরা হজ: ২৯)

অতঃপর ক্বা'বা গৃহের ত্বাওয়াফ ও মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাক'আত নামায আদায় করবে। এরপর সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সা'য়ী করবে, যদি হাজী তামাত্তু হজ পালনকারী হয়। আর এই সা'য়ী হবে তার হজের সা'য়ী, প্রথম সা'য়ী ছিল তার উমরার সা'য়ী।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অনুসারে আলেমগণের নিকট অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত হলো: তামাত্তু হজ পালনকারীর জন্য এক সা'য়ী যথেষ্ট নয়।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

" خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم "

অর্থ: "আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হজ পালনের উদ্দেশ্যে বের হলাম।----আল-হাদীস।"

এই হাদীসেরই একস্থানে আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

« مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا »

অর্থ: "তদানুসারে, যে ব্যক্তির সাথে কুরবানীর পশু রয়েছে সে যেন হজের সাথে উমরার জন্যও তালবিয়া পাঠ করে নেয় এবং উমরা ও হজ উভয়টি সম্পন্ন না করা পর্যন্ত হালাল হবে না।"

অত:পর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হাদীসের শেষাংশে বলেন:

« فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ »

অর্থ: "সে অনুসারে যারা শুধু উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছিল তারা বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করে হালাল হয়ে গেল। তারপর মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের হজের জন্য

আরেকটি ত্বাওয়াফ তারা করলেন।” (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসে উমরার জন্য তালবিয়া পাঠকারীদের সম্পর্কে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উক্তি: “তারা মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাদের হজের জন্য আরেকটি ত্বাওয়াফ করলেন” এর দ্বারা তিনি সাফা-মাওয়ার মধ্যে ত্বাওয়াফ অর্থাৎ সা'য়ী উদ্দেশ্য করেছেন। এটিই হাদীসের ব্যাখ্যাকারী আলেমগণের বিশুদ্ধতম অভিমত।

আর যারা একথা বলে যে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) একথা দ্বারা 'তাওয়াফে ইফাজা' উদ্দেশ্য করেছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, ত্বাওয়াফে ইফাজা সব হাজীর ক্ষেত্রে হজের অপরিহার্য একটি রুকন যা তারা সবাই সম্পাদন করে ফেলেছেন। বস্তুত: এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে ঐ ত্বাওয়াফ বা তামাত্তু হজ পালনকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট ; আর সেটা সাফা-মাওয়ার মধ্যেকার দ্বিতীয়বারের সা'য়ী যা সে মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার হজ সম্পন্নের উদ্দেশ্যে করে থাকে। আলহামদুলিল্লাহ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। আর এটা অধিকাংশ উলামাদের মত।

এই ব্যাখ্যার বিশুদ্ধতা প্রমাণে ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে যে হাদীস সিদ্ধান্তসূচক শব্দে তা'লীক সহকারে বর্ণনা করেছেন তা উপস্থাপন করা যায়। তাঁকে যখন তামাত্তু হজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন:

“মুহাজির ও আনসারগণ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সহধর্মিনীগণ বিদায় হজের সময় ইহরাম বাঁধলেন।

আমরাও ইহরাম বাঁধলাম। যখন আমরা মক্কায় পৌঁছলাম তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

"তোমরা তোমাদের হজের ইহরামকে উমরার ইহরামে পরিণত কর, তবে ঐ ব্যক্তিগণ ছাড়া যারা কুরবানীর পশু চালিয়ে আসছে।"

সেই মতে, আমরা বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করি, সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করি, স্ত্রীদের কাছে গমন করি এবং স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:

"যারা কুরবানীর পশু চালিয়ে আসছে তারা কিন্তু হালাল হবে না যতক্ষণ না সেই পশু তার নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ যবেহ করার স্থানে পৌঁছে।"

অত:পর তারভিয়ার দিন অর্থাৎ ৮ই যিলহজ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে হজের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দিলেন। তারপর যখন আমরা হজের কার্যাবলী সমাপ্ত করলাম তখন আমরা এসে বায়লাতুল্লাহ শরীফের ত্বাওয়াফ করলাম এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করলাম। বক্তব্য এখানে সমাপ্ত।

এই হাদীস দ্বারা তামাত্তু হজ পালনকারীদের জন্য দু দফা সা য়ী করার অপরিহার্যতা স্পষ্ট হয়ে গেল।

আর ইমাম মুসলিম জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবাগণ মাত্র একবারই সাফা-মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করেছিলেন অর্থাৎ তাদের সেই প্রথম সা'য়ী সাফা-মারওয়ার মধ্যে পরে আর কোন সা'য়ী করেননি; এই হাদীস সেই সব সাহাবাগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা ইহরাম বাঁধার সময় কুরবানীর পশু চালিয়ে

এসেছিলেন। কেননা, তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে উমরা ও হজ থেকে একসাথে হালাল হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একসাথে হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধেছিলেন। আর যে সাহাবী কুরবানীর পশু চালিয়ে আসছেন তাঁকে উমরার সাথে হজেরও ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন এবং তিনি যেন উমরাহ ও হজ উভয়টি থেকে ফারেগ না হওয়া পর্যন্ত হালাল না হন।

ক্বিরাণকারীর উপর একবার মাত্র সা'য়ী ওয়াজিব। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসহ অন্যান্য আরো অনেক হাদীস এর প্রমাণ।

এভাবে যে ব্যক্তি ইফরাদ হজ পালন করবে এবং কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরামে বহাল থাকবে তার উপর একবারমাত্র সা'য়ী ওয়াজিব হবে। সুতরাং ক্বিরান ও ইফরাদ পালনকারী উভয়ই যদি ত্বাওয়াফে কুদুমের পর সাফা-মারওয়ায় সা'য়ী করে থাকে তাহলে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট হবে, ত্বাওয়াফে ইফাজার পর আর সা'য়ী করার প্রয়োজন নেই।

এভাবে আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়ের দুই হাদীস এবং জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এর দ্বারা পারস্পরিক বৈশাদৃশ্য দূরীভূত হবে এবং সবগুলো হাদীসের উপর আমল করাও সম্ভব হবে।

এই সামঞ্জস্যের কথাও বলা যায় যে, আয়েশা ও ইবনে আব্বাসের হাদীসদ্বয় সহীহ এবং উভয় হাদীস দ্বারা তামাত্তু হজ পালনকারীর জন্য দ্বিতীয়বার সা'য়ী সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে, জাবের (রাযিয়াল্লাহু

আনহু)-এর হাদীস তা অস্বীকার করে। এমতাবস্থায়, ইলমে উসূল ও হাদীসের পরিভাষাগত বিদ্যার দৃষ্টিতে সাব্যস্তকারী হাদীস অস্বীকারকারী বা না সূচক হাদীসের উপর অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই সঠিক তথ্য লাভের তাওফীকদাতা। তাঁর সাহায্য ব্যতীত কারো কোন শক্তি-সামর্থ নেই।

কুরবানীর দিনে হাজীদের জন্য করণীয় কার্যসমূহের সর্বোত্তম শ্রেণী বিন্যাস

হাজীদের জন্য কুরবানীর দিন উপরোক্ত এই চারটি কাজ উল্লেখিত ধারাবাহিকতা অনুসারে সম্পাদন করা শ্রেয়। সেই মতে সেদিন সর্বপ্রথম কাজ হবে জামরাতুল আক্বাবায় (বড় জামরায়) কঙ্কর নিক্ষেপ করা, তারপর কাজ হবে কুরবানী করা, তারপর মাথা মুণ্ডন করা বা মাথার চুল ছোট করা, এরপর বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফ করা এবং তামাত্তু হজ পালনকারী হলে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী করা। এভাবে ইফরাদ বা ক্বিরান হজ পালনকারীকেও সা'য়ী করতে হবে যদি তিনি ত্বাওয়াফে কুদুমের অর্থাৎ সর্বপ্রথম ত্বাওয়াফের সাথে সা'য়ী না করে থাকেন।

এই চারটি কাজ সম্পাদন কালে উল্লেখিত ধারাবাহিকতার যদি কোন ব্যতিক্রম ঘটে এবং কাজগুলোর কোনটি আগে বা পরে করা হয় তাহলেও আদায় হয়ে যাবে। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এর অনুমতির প্রমাণ রয়েছে।

ত্বাওয়াফের পূর্বে সা'য়ী করাও এই রুখসতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এটিও কুরবানীর দিবসে করণীয় কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এই বিষয়টিও সেই সাহাবীর ভাষ্যের মধ্যে পড়ে। সাহাবী বলেছিলেন: "সেদিন অর্থাৎ কুরবানীর দিন আগে-পরে সম্পাদিত করা হয়েছে এমন যে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

« افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ »

অর্থ: "করতে পার, এতে কোন দোষ নেই।"

যেহেতু এ জাতীয় বিষয়ে ভুল ও অজ্ঞতাবশতঃ ব্যতিক্রম ঘটতে পারে, সুতরাং সহজসাধ্যতা ও সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে ত্বাওয়াফ ও সা'য়ী এর আগে-পরে হওয়ার ব্যাপারটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাধারণ রুখসাতের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাবেত আছে যে, ত্বাওয়াফের পূর্বে সা য়ী করে ফেলেছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: 'কোন ক্ষতি নেই'। ইমাম আবু দাউদ উসামা বিন শারীকের বর্ণনায় এই হাদীসটি বিশুদ্ধ সনদে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে এই বিষয়টি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ রুখসাতের যে অন্তর্ভুক্ত তা পরিস্কার হয়ে গেল। আল্লাহই আমাদের তাওফীকদাতা।

যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করার পর হাজীগণ সম্পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যায় তা মোট তিনটি, যথা: জামরাতুল আক্বাবায় (বড় জামরায়) কঙ্কর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা এবং সা'য়ীসহ ত্বাওয়াফে ইফাজা করা ঐ সমস্ত হাজীদের জন্য যাদের কথা এইমাত্র উল্লেখ করা হলো। অতএব হাজীগণ যখন এই তিনটি কাজ সম্পন্ন করবে, তখন তার জন্য ইহরামের কারণে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ ছিল সেগুলো হালাল হয়ে যাবে। যেমন: স্ত্রীসহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার ইত্যাদি। আর যা হজ পালনকারী উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে দু'টি সম্পন্ন করবে তার জন্য স্ত্রী সহবাস ব্যতিরেকে অন্যান্য সবকিছু হালাল হয়ে যাবে যা ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ ছিল। এই হালাল হওয়াকে তাহাল্লুলে আউয়াল অর্থাৎ 'প্রথম হালাল' বলা হয়।

হাজীদের জন্য যমযমের পানি তৃপ্তিভরে পান করা এবং তাঁর জন্য

সহজসাধ্য উপকারী (দুয়াগুলো) পাঠ করা মুস্তাহাব। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে: যমযমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হয় সে উদ্দেশ্য পুরন হয়।

সহীহ মুসলিমে আবূ জর গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যমযমের পানি সম্পর্কে বলেছেন:

« إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ »

অর্থ: "নিশ্চয়ই যমযমের পানি একটি উত্তম খোরাক।"

ইমাম আবূ দাউদ এর বর্ণনায় অতিরিক্ত এই অংশটুকুও রয়েছে:

« وَشِفَاءُ سُقْمٍ »

অর্থ: "এবং রোগের একটি চিকিৎসা।"

ত্বাওয়াফে ইফাজা এবং যার উপর সা'য়ী জরুরী তার সা'য়ী করার পর হাজীগণ মিনায় প্রত্যাবর্তন করবে। সেখানে তিন রাত অবস্থান করবে এবং প্রতিদিন সূর্য ঢলার পর তিন জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব।

সুতরাং শ্রেণীমত প্রথম জামরায়-কঙ্কর নিক্ষেপ শুরু করবে। এটি মসজিদে খায়েফের নিকটতম জামরাহ। এতে পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর সহকারে হাত উঠাবে। এরপর সুন্নাত হলো: জামরাহ থেকে একটু পিছনে সরে, তাকে বামপার্শ্বে রেখে ক্বেবলামুখী হবে এবং উভয় হাত উঠিয়ে আল্লাহু তায়ালার কাছে কাকুতি-মিনতি সহকারে বেশি বেশি দুয়া করবে।

এরপর দ্বিতীয় জামরার নিকট পৌঁছে প্রথম জামরার ন্যায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এখানে সুন্নাত হলো: কঙ্কর নিক্ষেপের পর সামনে কিছুটা অগ্রসর হবে এবং জামরাকে ডান পার্শ্বে রেখে ক্বিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে অধিক মাত্রায় আল্লাহর নিকট দুয়া করবে।

তারপর তৃতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। তবে এই জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর সেখানে দাঁড়ানো যাবে না।

এরপর আইয়ামে তাশরীক্বের দ্বিতীয় দিনে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার পর প্রথম দিনের ন্যায় সব জামরাগুলোতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সঠিক অনুসরণ করে প্রথম দিনের ন্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় জামরার নিকট যা করেছিল ঠিক তাই করবে।

জ্ঞতব্য যে, আইয়ামে তাশরীকের প্রথম দুই দিন কঙ্কর নিক্ষেপ করা হজের অন্যতম ওয়াজিব। এভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় রাতে মিনায় অবস্থান করাও প্রত্যেক হাজীর উপর ওয়াজিব। তবে পানি পরিবেশনকারী, রাখাল ও তদ্রূপ দায়িত্বশীল লোকদের উপর এই অবস্থান ওয়াজিব নয়।

উপরোক্ত দুই দিন কঙ্কর নিক্ষেপের পর যারা মিনা থেকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চায় সে চলে যেতে পারে, কোন বাধা নেই। তবে ঐদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা থেকে বের হয়ে যেতে হবে। আর যে ব্যক্তি বিলম্ব করে তৃতীয় রাত মিনায় অবস্থান করবে এবং তৃতীয় দিন কঙ্কর নিক্ষেপের কাজ সম্পন্ন করে আসবে তাহলে তার জন্য সেটা হবে উত্তম ও অধিক সওয়াবের কারণ।

আল্লাহ পাক বলেন:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ

عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

অর্থ: "তোমরা গণনার (তাশরীকের ১১, ১২ ও ১৩ই জিলহজ) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর যিকির কর। আর যে ব্যক্তি দু'দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চায়, সে চলে যেতে পারে, তার উপর কোন দোষ হবে না। আর যে বিলম্ব করে তার উপরও কোন দোষ নেই, যে আল্লাহকে ভয় করে চলে।" (সূরা বাক্বারা: ২০৩)

(বিলম্ব করে ১৩ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ করে যাওয়া উত্তম ও অধিক সওয়াবের কারণ।) এজন্য যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদেরকে দু দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি নিজে চলে যাননি; বরং তিনি মিনায় অবস্থান অব্যাহত রাখেন এবং তৃতীয় দিন সূর্য ঢলার পর কঙ্কর নিক্ষেপ করে যোহরের নামায আদায়ের পূর্বেই মিনা থেকে প্রস্থান করেন।

কঙ্কর নিক্ষেপ করতে অক্ষম বালকের পক্ষ হতে তার অভিভাবকের জন্য জামরাতুল আক্বাবাসহ সবক'টি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েয আছে। অভিভাবক প্রথমে নিজের, তারপর বালকের পক্ষ হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এভাবে কঙ্কর নিক্ষেপে অক্ষম বালিকার পক্ষ হতে তার অভিভাবকের কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েয আছে। এর প্রমাণ- জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন:

«حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ»

অর্থ: "আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে হজ করলাম। আমাদের সাথে অনেক নারীলোক ও বালক-বালিকা ছিল। আমরা বালক-বালিকাদের পক্ষ হতে তালবিয়াহ পাঠ করি এবং তাদের পক্ষ হতে কঙ্করও নিক্ষেপ করি।"

হাদীসটি ইমাম ইবনে মাযাহ বর্ণনা করেছেন।

কঙ্কর নিক্ষেপে অক্ষম অসুস্থ ব্যক্তি বয়স্ক লোক অথবা গর্ভবতী নারীর পক্ষে কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা জায়েয আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থ: "তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করো।" (সূরা তাগাবুন: ১৬)

কারণ, এরা সময়মত জামরাতগুলোর নিকট লোকের ভীড় মুকাবেলায় সক্ষম নয়। অথচ পাথর নিক্ষেপের সময় চলে গেলে তার ক্বাজা আদায় করার প্রয়োজন হয় না। তাই এই কাজের জন্য অন্যকে প্রতিনিধি নিয়োগ করার বৈধতা রয়েছে। পক্ষান্তরে, হজের অন্যান্য কাজের জন্য কোন উকিল নিয়োগ জায়েয নয়। সুতরাং কোন মুহরিম ব্যক্তির জন্য তার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য অন্যকে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবে না। যদিও তার এই হজ নফল হয়ে থাকে। কেননা, যে ব্যক্তি হজ বা উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে ফেলে-যদিও তা নফল হয়ে থাকে, তাকে তা সম্পন্ন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

অর্থ: "তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা সম্পন্ন করো।"

(সূরা বাকারা: ১৯৬)

উল্লেখ্য যে, ত্বাওয়াফ বা সা য়ী এর সময় (অল্প সময়েই) ছুটে যায় না। পক্ষান্তরে, কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ছুটে যায়।

আর আরাফায় অবস্থান এবং মিনা ও মুযদালিফায় রাত যাপনের বেলায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এগুলোর সময় নির্দিষ্ট বিধায় তা ছুটে যায়; কিন্তু কষ্টসাধ্য হলেও অক্ষম ব্যক্তির জন্য এসব স্থানে অবস্থান গ্রহণ সম্ভব। পক্ষান্তরে কঙ্কর নিক্ষেপের বিষয়টি সেরূপ নয়। উপরোক্ত শুধু অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধি নিয়োগের বিষয় সালাফে সালেহীন হতে সাব্যস্তরূপে বর্ণিত রয়েছে।

জেনে রাখা দরকার, যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত নির্দেশের ভিত্তিতেই সীমাবদ্ধ। দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন প্রকার ইবাদত প্রবর্তন করার কারো কোন অধিকার নেই।

কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য উকিল বা প্রতিনিধির পক্ষে তিন জামরার প্রত্যেক জামরায় প্রথমে নিজের পক্ষ হতে এবং পরে তার মুওয়াক্কিলের তরফ হতে একই স্থানে দাঁড়িয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয আছে। তার পক্ষে নিজের জন্য প্রথমে সবক'টি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ সমাপ্ত করে তারপর তার মুওয়াক্কিলের তরফ হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব নয়। এটাই আলেমগণের বিশুদ্ধতর অভিমত। কেননা, এই শেষোক্ত পদ্ধতির পক্ষে কোন দলীল নেই এবং এর মধ্যে কষ্ট-ক্লেশ ও জটিলতা নিশ্চয়ই রয়েছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের জন্য ধর্মে কোন জটিলতা রাখেননি।"

(সূরা হজ: ৭৮)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:

« يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا »

অর্থ: "তোমরা সহজ করো এবং কঠিন করো না।"

এতদ্ব্যতীত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন সাহাবী থেকেও এরূপ কার্যক্রমের কোন বর্ণনা পাওয়া যায়নি, যখন তারা আপন আপন বালক-বালিকা ও অক্ষম লোকদের পক্ষ হতে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন। তারা যদি এরূপ করতেন তাহলে নিশ্চয়ই তা বর্ণনায় আসতো; যেহেতু বর্ণনার সব রকম সুযোগ ও উদ্যোগ বিদ্যমান ছিল। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

ক্বিরান ও তামাত্তু হজ পালনকারীর উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গ

হাজী যদি তামাত্তু অথবা ক্বিরান হজ সম্পাদনকারী হন এবং তিনি মসজিদে হারামের এলাকার বাসিন্দাও না হন তাহলে তার উপর পশু কুরবানী করা ওয়াজিব হবে, আর তা হবে একটি ছাগল অথবা এক সপ্তমাংশ উট অথবা এক সপ্তমাংশ গরু। এই কুরবানীর পশু হালাল মাল এবং সিদ্ধ উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকে হতে হবে। কেননা:

"আল্লাহ তায়ালা পাক পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবূল করেন না।"

একজন মুসলমানের জন্য লোকদের নিকট তারা রাজা-বাদশাহ বা অন্য যে কেউ হোক-কারো কাছে কুরবানীর জানোয়ার অথবা অন্য কিছুর জন্য সওয়াল করা (চাওয়া) থেকে বিরত থাকা উচিত, যেহেতু আল্লাহ পাক তাকে তার সম্পদ থেকে নিজের জন্য কুরবানী দেয়া সহজ করে দিয়েছেন এবং অপরের মাল-সম্পদ থেকে তাকে অমুখাপেক্ষী রেখেছেন। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এমন বহু হাদীস বর্ণিত আছে যেগুলোতে অন্যের কাছে সওয়াল করাকে নিন্দনীয় ও দোষণীয় কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং যে এ ধরণের কাজ থেকে বিরত থাকে তার প্রশংসা করা হয়েছে।

আর যদি তামাত্তু ও ক্বিরান হজ পালনকারী হাদী অর্থাৎ পশু কুরবানী করতে অপারগ হয়, তাহলে তার জন্য ওয়াজিব হবে হজের সময় তিন দিন এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন মোট দশ দিন রোজা পালন করা। প্রথম তিনটি রোযা সে ইচ্ছা করলে কুরবানীর দিনের পূর্বে বা ইচ্ছা করলে আইয়ামে তাশরীকের তিনটি

দিনে (অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩ই জিলহজ) রাখতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

অর্থ: "তামাত্তু হজ পালনকারী তার সাধ্যানুসারে পশু কুরবানী করবে। আর যার জন্য তা সহজলভ্য না হয়, সে হজের সময় তিন দিন এবং স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর সাত দিন এই পূর্ণ দশ দিন রোযা পালন করবে। এই রোযা পালন তাদের জন্য যারা মসজিদে হারাম এলাকার বসবাসকারী নয়।" (সূরা বাকারা: ১৯৬)

বোখারী শরীফে আয়েশা ও ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেছেন:

«لَمْ يُرَخَّصْ فِى أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ ، إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْىَ»

অর্থ: "আইয়ামে তাশরীকের (জিলহজের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখের) দিনে কেবলমাত্র সেই সব লোকের জন্য রোযা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যারা কুরবানীর পশু সংগ্রহ করতে পারে না।"

এই হাদীস হুকুমের দিক দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত মারফু' হাদীসের সমপর্যায়ের।

উক্ত তিন রোযা আরাফাতের দিনের পূর্বে রাখাই উত্তম যাতে হজ পালনকারী আরাফাতের দিনে রোযা না রাখা অবস্থায় থাকতে পারে। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফাতের দিনে

রোযা না রাখা অবস্থায় অবস্থান করেছিলেন এবং সাহাবাগণকে আরাফাতের দিনে আরাফায় অবস্থানকালে রোযা পালন করতে নিষেধ করেছেন। অন্য একটি কারণ এই যে, এই দিনে রোযা না রাখা অবস্থায় হজ পালনকারী আল্লাহর যিকির ও দুয়ার কাজে অধিকতর তৎপর ও সক্রিয় হতে পারে।

উক্ত এই তিন দিনের রোযা এক সাথে অথবা পৃথক পৃথক ভাবেও রাখা যেতে পারে। এভাবে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর অপর সাত রোযা এক সাথে রাখা ওয়াজিব নয়; বরং একসাথে অথবা পৃথক পৃথক ভাবে রাখা জায়েয আছে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা এই রোযার বেলায় একসাথে রাখার কোন শর্তারোপ করেননি। এভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তা করেননি। উত্তম হলো এই সাত রোযা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত দেরী করে রাখা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

অর্থ: "আর সাত রোযা রাখবে যখন তোমরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করবে।" (সূরা বাকারা: ১৯৬)

হাদী অর্থাৎ কুরবানী করতে অক্ষম হাজীর পক্ষে রাজা-বাদশাহ বা অন্য কারো কাছে নিজের পক্ষ হতে কুরবানীর উদ্দেশ্যে পশু চাওযার চেয়ে রোযা রাখা উত্তম। আর যদি বিনা সওয়ালে বা বিনা লোভ-লালসায় তাকে যদি হাদী অথবা অন্য কিছু দেয়া হয় তাহলে কোন আপত্তি নেই, যদিও সে অন্য লোকের পক্ষ হতে বদলী হজ পালনকারী হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি তাকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরক ব্যক্তি প্রদত্ত অর্থ হতে হাদী ক্রয় করার শর্ত না করে থাকে।

কোন কোন লোক সরকার বা অথবা অন্যদের কাছে অপর লোকদের নামে হাদী বা কুরবানীর পশুর জন্য সওয়াল করে থাকে, তা নিঃসন্দেহে হারাম। কেননা, তা মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সমতুল্য। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ও সকল মুসলমানদের এ জাতীয় কাজ হতে মুক্ত রাখুন।

أحكام الزِّيارة وآدابها

যিয়ারতের নিয়ম ও আদব[1]

মদীনা শরীফে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)এর মসজিদ হজ্জের পূর্বে পরে সকল সময় যিয়ারত করা সুন্নাত। কেননা বুখারী ও মুসলিমে এসেছে, আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

আমার এই মসজিদে এক নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম।[2]

ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (মুসলিম)[3]

আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায অন্য মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়ে উত্তম। তবে মসজিদে হারাম ব্যতীত। মসজিদে হারামে এক নামায এ মসজিদে একশত নামাযের চেয়ে বেশী উত্তম।[4]

---

1 . দ্রঃ মাজমু ফাতাওয়া ১৬/৯৯-১১৭

2 . বুখারী, অধ্যায়ঃ দরূদ পড়ার ফযীলত। অনুচ্ছেদঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত। হা/১১৯০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত। হা/১৩৯৪।

3 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত। হা/১৩৯৫।

4 . আহমাদ (৪৫) ইবনে হিব্বান হা/১৬১৮।

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, « صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِن أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِن مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» আমার এই মসজিদে এক নামায অন্য মসজিদে একহাজার নামাযের চেয়ে উত্তম, মসজিদে হারাম ব্যতীত। কেননা মসজিদে হারামে এক নামায অন্য মসজিদে এক লক্ষ নামাযের চেয়ে উত্তম।[1]

এ অর্থে অনেক হাদীছ আছে।

মসজিদে নববীর যিয়ারতকারী মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা আগে বাড়াবে এবং এই দুয়াটি পড়বেঃ

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ »

অর্থঃ “মহান আল্লাহর নিকট তাঁর সম্মানিত সত্তা এবং চিরস্থায়ী রাজত্বের উসিলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দাও।”

অন্যান্য মসজিদে প্রবেশ করার মতই মসজিদে নববী প্রবেশ করার দুয়া। এর জন্য আলাদা বিশেষ কোন দুয়া নেই।

তারপর দু রাকাত সালাত আদায় করবে। এরপর দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চেয়ে যে কোন দুয়া করবে। যদি রওযা শরীফে গিয়ে সালাত পড়তে পারে, তবে আরো উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু

1 আহমাদ ৩/৩৪৩, ২৯৮। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ নামায কায়েম করা এবং তাতে সুন্নাত, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে হারামে সালাতের ফযীলত। হা/ ১৪০৬।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ» আমার গৃহ ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের একটি বাগিচা।[1]

সালাতের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর ও তাঁর দু সাহাবী আবু বকর ও ওমার (রাঃ)এর কবর যিয়ারত করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের সাম্মুখে আদব, সম্মানের সাথে দাঁড়াবে এবং নীচু আওয়াজে তাঁকে সালাম দিবে। বলবে, আস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাসান সনদে আবু দাউদে এভাবেই সালামের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «مَا مِن أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ الله عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» যে কেউ আমাকে যখন সালাম দিবে, তখন আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দিবেন, তখন আমি তার সালামের জবাব দিব।[2]

যিয়ারতকারী যদি এভাবে সালাম বলে তাতেও কোন অসুবিধা নেইঃ

আস সালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ, আস সালামু আলাইকা ইয়া খিয়ারাতাল্লাহি মিন খালকিহি, আস সালামু আলাইকা ইয়া

---

1 বুখারী, অধ্যায়ঃ নফল নামায, অনুচ্ছেদ: কবর ও মিম্বরের মাঝে সালাতের মর্যাদা। হা/১১৩৭, ১১৩৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কবর ও মিম্বারের মাঝে জান্নাতের একটি বাগিচা। হা/১৩৯০, ১৩৯১। আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আল মাযেনী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

2 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ মানাসেক, অনুচ্ছেদঃ কবর যিয়ারত। হা/২০৪১।

সাইয়্যেদুল মুরসালিন, ইমামুল মুত্তাকীন। আশহাদু আন্নাকা বাল্লাগতার রিসালাহ, ওয়া আদ্দায়তাল আমানাহ, ওয়া নাসাহতাল উম্মাহ। ওয়া জাহাদতা ফিল্লাহি হাক্কা জিহাদিহি।

এগুলো সবই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী। তাঁর উপর দরূদ পাঠ করবে। তাঁর জন্য দুয়া করবে। দরূদ ও সালাম একত্রিত বলাটাই শরীয়তের সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয় আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর উপর দরূদ পড়েন। হে মুমিনগণ তোমরাও তাঁর উপর দরূদ পাঠ কর এবং সালাম দাও। (আহযাবঃ ৫৬)

তারপর আবু বকর ও ওমার (রাঃ)কে সালাম দিবে। তাঁদের জন্য দুয়া করবে এবং তাঁদের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির দুয়া করবে।

ইবনে ওমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এবং তাঁর দু সাহাবীকে সালাম দেয়ার সময় বলতেনঃ

আস সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আস সালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর, আস সালামু আলাইকা ইয়া আবাতাহ।[1] তারপর তিনি চলে যেতেন।

এই যিয়ারতের অনুমতি শুধু পুরুষদের জন্য। নারীদের কোন ধরণের কবর যিয়ারতে যাওয়া যাবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, ((لَعَنَ

1 . বাইহাকী সুনানে কুবরা। হা/ ১০৫৭০, (২/২৪৬)

«زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمَتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» তিনি কবর যিয়ারতকারীনী এবং যারা কবরে মসজিদ বানায় ও বাতি জালায় তাদেরকে লানত করেছেন।[1]

কিন্তু মদীনার মসজিদে সালাত আদায় করা ও সেখানে দুয়া প্রভৃতি যা অন্যান্য মসজিদেও জায়েয সে উদ্দেশ্যে মদীনা গমণ করা পুরুষ-নারী সকলের জন্যেই জায়েয।

যিয়ারতকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে মসজিদে নববীতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায যতদূর সম্ভব জামাআতের সাথে আদায় করা, বেশী বেশী দুয়া ও যিকির করা এবং অন্যান্য নফল নামায সমূহও আদায় করা।

রওযা শরীফে বেশী বেশী নফল নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা রওযার ফযীলত সম্পর্কে পূর্বে হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الْجَنَّةِ» আমার গৃহ ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে জান্নাতের একটি বাগিচা।[2]

কিন্তু ফরয নামাযের জন্য যিয়ারতকারী এবং অন্য মুসল্লীদের জন্য উচিত হচ্ছে, সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং সাধ্যানুযায়ী

---

1 . আহমাদ, ১/৩৩৭। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ নারীদের কবর যিয়ারত, হা/৩২৩৬। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ সালাতের সময়, অনুচ্ছেদঃ কবরে মসজিদ বানানো নিষেধ, হা/৩২০। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ রাতের ও দিনের নফল নামায, অনুচ্ছেদঃ কবরে বাতি জালানো নিষেধ, হা/২০৪৩। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ নারীদের কবর যিয়ারত নিষেধ। হা/১৫৭৫।

2 বুখারী, অধ্যায়ঃ নফল নামায, অনুচ্ছেদ: কবর ও মিম্বরের মাঝে সালাতের মর্যাদা। হা/১১৩৭, ১৩৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কবর ও মিম্বারের মাঝে জান্নাতের একটি বাগিচা। হা/১৩৯০, ১৩৯১। আবদুল্লাহ বিন যায়েদ আল মাযেনী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

প্রথম কাতারের দিকে নামায পড়তে আগ্রহী থাকা।

অনেক সহীহ হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম কাতারে সালাত আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমনঃ তিনি বলেছেন,

« لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا »

মানুষ যদি জানত আযান দেয়ায় এবং প্রথম কাতারে নামায আদায় করলে কি ফযীলত আছে, তবে (কে আযান দিবে আর কে প্রথম কাতারে নামায পড়বে তা নির্ধারণ করার জন্য) লটারী করা ছাড়া তারা কোন উপায় পেত না, তখন লটারী করতে বাধ্য হত। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন,

« تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَن بَعْدَكُمْ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ الله »

তোমরা সামনে অগ্রসর হয়ে আমার অনুসরণ কর, তোমাদের পরবর্তীরা তোমাদের অনুসরণ করবে। কোন জাতি পিছনে থাকাকে পছন্দ করলে, আল্লাহও তাদেরকে পিছনে রেখে দিবেন। (মুসলিম)2

---

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, অনুচ্ছেদ: আযানের জন্য লটারী করা। হা/ ৬১৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ কাতার সোজা করা, হা/৪৩৭। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

2 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ কাতার সোজা করা, হা/৪৩৮। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন হাসান সনদে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ الله فِي النَّارِ»

কোন জাতি যদি প্রথম কাতার থেকে পিছনে থাকতেই থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে পেছনেই রেখে দিবেন এবং পরিশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[1]

তিনি তাঁর সাহাবীদের আরো বলেছেন, ফেরেশতারা যেভাবে তাদের পালনকর্তার সামনে কাতারবদ্ধ হয়, তোমরা কি সেভাবে কাতার করবে না? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফেরেশতারা কিভাবে তাঁদের পালনকর্তার সামনে কাতারবদ্ধ হয়? তিনি বললেন, প্রথম দিকের কাতারগুলো তাঁরা পূর্ণ করেন এবং কাতারকে মিলিত করে দাঁড়ান। মুসলিম।[2]

এ অর্থের হাদীছ অনেক রয়েছে। এ হাদীছগুলো যেমন মসজিদে নববীর জন্য প্রযোজ্য, অন্যান্য মসজিদের জন্যও তেমন প্রযোজ্য। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে কাতারের ডান দিকে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করতেন। আর এ কথা সকলের জানা যে, মসজিদে নববীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে কাতারের ডান দিক ছিল রওযা শরীফের বাইরের অংশ। এ থেকে জানা গেল, প্রথম কাতার ও কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানোকে রওযা শরীফে নামায আদায় করার চেয়ে অধিক

1 আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ নারীদের কাতার এবং প্রথম কাতার থেকে দূরে থাকা অপছন্দনীয় হওয়ার বর্ণনা, হা/৬৭৯। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

2 মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ সালাতে স্থীর থাকা, হা/৪৩০।

প্রাধান্য দিতে হবে। রওযা শরীফের চেয়ে এ দুটি বিষয়ের প্রতি যত্ন বেশী নিতে হবে। এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করলে যে কেউ একথা বুঝতে পারবে।

মসজিদে নববীতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুজরা শরীফকে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা বা তার তাওয়াফ করা কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয়। কেননা এগুলো সালাফে সালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়। তাই তা বিদআত ও গর্হিত কাজ।

নবীজীর কবরের কাছে গিয়ে কারো জন্য জায়েয নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রয়োজন মেটানোর জন্য, বিপদ দূর করার জন্য বা রোগ মুক্তি ইত্যাদির জন্য প্রার্থনা করা। কেননা এ সকল বিষয়ে প্রার্থনা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে। আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে এগুলো প্রার্থনা করা আল্লাহর সাথে শিরক এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। দ্বীন ইসলাম দুটি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

প্রথমঃ আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করা।

দ্বিতীয়ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যে নিয়ম প্রণয়ন করেছেন তার বাইরে ইবাদত না করা।

এটাই হচ্ছে কালেমায়ে শাহাদতের অর্থ। আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শাফায়াত চাইবে না। কেননা শাফায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহ। তাই তিনি ব্যতীত কারো নিকট তা চাইবে না। আল্লাহ বলেন, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا আপনি বলে দিন, সকল প্রকার শাফায়াত আল্লাহর অধিকারে। (যুমারঃ ৪৪)

এভাবে বলা যেতে পারেঃ হে আল্লাহ আমার ব্যাপারে তোমার নবীর শাফায়াত কবুল কর। হে আল্লাহ আমার ব্যাপারে তোমার ফেরেশতা এবং তোমার মুমিন বান্দাদের শাফায়াত কবুল কর। হে আল্লাহ আমার ব্যাপারে আমার ছোট শিশুদের শাফায়াত কবুল কর... ইত্যাদি।

কিন্তু মৃতের নিকট থেকে শাফায়াত বা অন্য কিছু চাইবে না। চাই তিনি নবী হোক বা অন্য কেউ। কেননা তা শরীয়ত সম্মত নয়। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির সকল আমল বন্ধ হয়েছে, কয়েকটি ব্যতীত যা সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ »

মানুষ মৃত্যু বরণ করলে তিনটি আমল ব্যতীত তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। সাকায়ে জারিয়া, উপকারী ইলম, সৎ সন্তানের দুয়া। (মুসলিম)[1]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় ও কিয়ামত দিবসে তাঁর নিকট থেকে শাফায়াত তলব করা জায়েয। কেননা তিনি তা দিতে সক্ষম। তিনি আল্লাহর সামনে গিয়ে তলবকারীর জন্য তা চাইতে পারবেন। কিন্তু দুনিয়াতে ‘জীবিত’ মানুষের কাছে সুপারিশ চাওয়াটা স্বাভাবিক বিষয়। এটা তাঁর জন্য খাস নয়। যে কোন

1 মুসলিম, অধ্যায়ঃ ওসিয়ত, অনুচ্ছেদঃ মানুষের মৃত্যুর পর যে ছোয়াব তার কাছে পৌঁছবে, হা/১৬৩১।

মানুষের কাছে যে কোন বিষয়ে আপনি সুপারিশ চাইতে পারেন। যে বিষয়ে ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা আছে। যেমন কোন মুসলিম তার ভাইকে বলল, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে এই এই বিষয়ে সুপারিশ করুন। অর্থাৎ ঐ বিষয়ে আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দুয়া করুন। আর যার কাছে এটা তলব করা হল তার জন্য জায়েয আছে সে তার ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে চাইবে এবং সুপারিশ করবে। তবে শর্ত হচ্ছে ঐ বিষয়টি বৈধ হতে হবে।

কিন্তু কিয়ামত দিবসে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ "আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কে এমন আছে যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে।" (বাকারাঃ ২৫৫)

মানুষের মৃত্যুর পরের অবস্থাকে মৃত্যুর আগের অবস্থার সাথে তুলনা করা জায়েয নেই। এমনকি পুনরুত্থানের অবস্থার সাথেও তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা মৃত্যুর সাথে সাথে আমল বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার আমল নিয়ে সে চলে গেছে। তবে শরীয়ত যে সমস্ত আমলের কথা ব্যতীক্রম বলেছে তার কথা ভিন্ন। যেমনটি পূর্বের হাদীছে বলা হয়েছে। এখন মৃতের কাছ থেকে শাফায়াত তলব করাটা শরীয়তে ব্যতীক্রমী বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব অনুমদিত বিষয়গুলোর মধ্যে শাফায়তকে শামিল করাটা জায়েয হবে না।

সন্দেহ নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পর বারযাখী জীবনে শহীদদের চেয়েও উত্তম ও পরিপূর্ণ অবস্থায় আছেন। কিন্তু তাঁর ঐ জীবন মৃত্যুর পূর্বের জীবনের অনুরূপ নয়। এমনকি তাঁর বারযাখী জীবন কিয়ামত দিবসের জীবনেরও অনুরূপ নয়। তাঁর এই জীবনটার প্রকৃত অবস্থা ও পদ্ধতি কিরূপ তা আল্লাহ

সুবহানাহু ছাড়া কেউ জানে না। এ জন্যে পূর্বে একটি হাদীছ উল্লেখ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ» যে কেউ আমাকে যখন সালাম দিবে, তখন আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দিবেন, আর তখন আমি তার সালামের জবাব দিব।[1]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর রূহ মোবারক তাঁর শরীর মোবারক থেকে বের হয়ে গেছে। কিন্তু সালামের সময় তাঁর রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয়। কুরআন-সুন্নাহতে অসংখ্য দলীল রয়েছে যা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু সুপ্রমাণিত। এতে বিদ্বানগণ ঐক্যমত। কিন্তু এই মৃত্যু বারযাখী বা কবরের জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে না। যেমন শহীদদের মৃত্যু তাদের বারযাখে বা কবরের মধ্যে জীবিত থাকাকে অস্বীকার করে না। যেমন আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

যারা আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত ধারণা করো না; বরং তারা আল্লাহর কাছে জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত। (আল ঈমরানঃ ১৬৯)

আমরা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত কথা বললাম। কারণ দরকার আছে, অনেক মানুষ এ নিয়ে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে মানুষকে শিরকের দিকে আহবান জানায় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃতদের

---

1 . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ মানাসেক, অনুচ্ছেদঃ কবর যিয়ারত। হা/২০৪১।

ইবাদত করতে প্রয়াস চালায়।

শরীয়তের খেলাফ প্রতিটি বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য এবং মুসলিমদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। সব বিষয়ে তিনি অধিক জ্ঞানী।

কোন কোন যিয়ারতকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের কাছে উচ্চস্বরে দুয়া করে এবং সেখানে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের এ কাজ শরীয়তের খেলাফ। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের নিষেধ করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কণ্ঠস্বরের উপর তাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করতে এবং আরো নিষেধ করেছেন তারা যেমন পরস্পরে সাথে জোরে জোরে যেমন কথা বলে তেমনভাবে যেন নবীর সামনে কথা না বলে। তিনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন নবীর সামনে কণ্ঠস্বরকে নীচু রাখতে। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

হে মুমিনগণ! নিজেদের আওয়াজ রসূলের আওয়াজের চেয়ে উঁচু করো না এবং উচ্চস্বরে নবীর সাথে কথা বলো না,যেমন তোমরা নিজেরা পরস্পর বলে থাকো। এমন যেন না হয় যে,(নবীর সাথে আদব রক্ষা না করার কারণে)তোমাদের অজান্তেই তোমাদের সব আমল ধ্বংস হয়ে যায়। যারা আল্লাহর রসূলের সামনে তাদের কণ্ঠ নিচু রাখে তারাই সেসব লোক,আল্লাহ যাদের অন্তরকে তাকওয়ার

জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার। (হুজুরাতঃ ২-৩)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবরের নিকট দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে এবং বেশী সালাম দেয়ার জন্য বারবার সেখানে গমণ করলে নিঃসন্দেহে ভীড় বৃদ্ধি হবে, শোর-গোল হবে বেশী এবং তাঁর কবরের কাছে আওয়াজও উঁচু হবে। তখন তা আল্লাহর শরীয়তের খেলাফ হয়ে যাবে, যা আল্লাহ এই আয়াতগুলোতে উল্লেখ করেছেন। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত ও মৃত সর্বাবস্থায় সম্মানিত। অতএব তাঁর কবরের কাছে শরীয়তের নির্ধারত আদবের খেলাফ করা কোন মুমিনের জন্য উচিত নয়।

কোন কোন যিয়ারতকারী কবরের কাছে দুয়া করতে আগ্রহী থাকে এই আশায় যে এখানে দুয়া করলে কবুল হবে। তারা কবরকে সামনে রেখে দুহাত তুলে দুয়া করে। তাদের এ কাজ সালাফে সালেহীন সাহাবায়ে কেরাম ও সঠিক নিয়মে তাঁদের অনুসারীদের নীতির খেলাফ। বরং এরূপ করা বিদআত। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ المَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ مِن بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»

তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে অনুসরণ করা। তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে এবং চাবলের দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখবে। দ্বীনের মাঝে নতুন উদ্ভাবন থেকে সাবধান। কেননা দ্বীনের মধ্যে উদ্ভাবিত প্রতিটি বিষয়

বিদআত। আর প্রতিটি বিদআত বিভ্রান্তি। [হাসান সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ ও নাসাঈ][1]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, « مَن أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ » যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।[2] মুসলিমের বর্ণনায় আছে, « مَن عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, যার পক্ষে আমার নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।3

আলী বিন হুসাইন যায়নাল আবেদীন (রাঃ) একদা দেখতে পেলেন জনৈক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের কাছে দুয়া করছে। তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করব না, যা আমি শুনেছি আমার পিতা থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন আমার দাদা থেকে, তিনি বর্ণনা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে। তিনি বলেন,

«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ »

---

1 . মুসনাদে আহমাদ ৪/১২৬। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাহ, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। হা/৪৬০৭

2 বুখারী, অধ্যায়ঃ সুলহ বা মিমাংসা। অনুচ্ছেদঃ যদি অন্যায়ের উপর মিমাংসা করে। হা/২৬৯৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ বিচার ফায়সালা, অনুচ্ছেদঃ বাতিল হুকুম প্রত্যাখ্যান করা। হা/১৭১৮।

3 মুসলিম, অধ্যায়ঃ বিচার ফায়সালা, অনুচ্ছেদঃ বাতিল হুকুম প্রত্যাখ্যান করা। হা/১৭১৮।

"তোমরা আমার কবরকে ঈদ উৎসব স্থল বানায়ো না। আর তোমাদের গৃহগুলোকে কবরস্থান করো না। (গৃহেও মাঝে-মধ্যে সালাত আদায় করো) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌঁছে যায়।" হাদীছটি বর্ণনা করেছেন হাফেয আবদুল ওয়াহেদ মাকদেসী গ্রন্থ [আহাদীছ মুখতারা]1

অনুরূভাবে কিছু কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবরে সালাম দেয়ার সময় নামাযে হাত বাঁধার মত করে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রেখে দাঁড়ায়। সালাম দেয়ার জন্য এ ধরণের পদ্ধতিতে দাঁড়ানো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবরের সামনে বা অন্য কোন রাজা-বাদশা বা নেতার সামনে জায়েয নয়। কেননা এটা এমন পদ্ধতির দাঁড়ানো যাতে আছে বিনয়, নিজেকে তুচ্ছ করার অনুভূতি এবং দাসত্ব। যা আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য সমিচীন নয়। যেমনটি হাফেয ইবনে হাজার রহ. উলামাদের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন। কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করে তবেই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে- যদি তার টার্গেট থাকে সালাফে সালেহীনের নীতিকে অনুসরণ করা।

কিন্তু কেউ যদি গোঁড়ামী, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও অন্ধ তাকলিদের কাছে পরাজিত হয় আর সালাফে সালেহীনের নীতির অনুসরণকারী দাঈদের প্রতি কুধারণা পোষণ করে, তবে তার বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলাম। তার জন্য ও আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে

---

1 . আহাদীছ মুখতারা, হা/৪২৮, পৃষ্ঠা ২৪৪। মুসনাদ আবু ইয়ালা হা/৪৬৯, ১/৩৬১। ইমাম আহমাদ হাদীছটি আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ২/৩৬৭। আরো বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাহ, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। হা/২০৪২। তবে তাদের হাদীছের বাক্য ভিন্ন। অচিরেই তার বিবরণ উল্লেখ করা হবে।

হেদায়াত ও তাওফীক চাই। যাতে আমরা হককে প্রাধান্য দিতে পারি।

আবার কোন কোন লোক মসজিদে নববীর মধ্যে দূর থেকেই কবর মুখী হয়ে দাঁড়ায়, আর ঠোঁট নাড়িয়ে সালাম দেয় ও দুয়া পাঠ করে। এটাও পূর্বে বর্ণিত বিদআতের মতই আরেকটি বিদআত। কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নয় দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু সৃষ্টি করা, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। এই আমলের মাধ্যমে সে ভালোবাস ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করার চেয়ে রূঢ়তাই অধিক প্রকাশ করছে। ইমাম মালেক (রহঃ) এ ধরণের আমলকে প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই উম্মতের পরবর্তী যুগের লোকেরা সঠিক পথের সন্ধান কখনই পাবে না, যে পর্যন্ত তারা অনুসরণ না করবে ঐ নীতির যার মাধ্যমে প্রথম যুগের লোকেরা সঠিক পথ পেয়েছিলেন।[1]

জ্ঞাতব্য যে, প্রথম যুগের লোকেরা সঠিক পথ পেয়েছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবায়ে কেরাম এবং সঠিকভাবে তাঁদের অনুসরণকারীদের রীতি-নীতিকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে। অতএব এই যুগের লোকেরা সঠিক পথ পাবে না, যে পর্যন্ত সালাফদের রীতি-নীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করবে।

আল্লাহ মুসলিমদের এমন কাজের তাওফীক দিন যাতে আছে তাদের নাজাত ও কামিয়াবী এবং দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জত। নিশ্চয় তিনি মহানদাতা অতি সম্মানিত।

1 . কাযী এয়ায বর্ণনা করেছেন আশ শিফা বেহুকুকিল মুস্তাফা, ১/৮৮।

تنبيه

সতর্কতা[1]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব নয় এবং হজ্জ ও উমরার জন্য শর্তও নয়। যেমনটি সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে। বরং যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মসজিদে যিয়ারত করতে গেছে বা যারা মদীনায় বসবাস করে তাদের জন্য কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব।

কিন্তু যারা মদীনার বাইরে দূরে বসবাস করে, তাদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা সফর করা জায়েয নয়। তার জন্য সুন্নাত হচ্ছে মসজিদে নববীতে সালাত আদায় করার জন্য সফর করা। যখন সে মদীনায় পৌঁছে যাবে এবং মূল উদ্দেশ্য (সালাত) বাস্তবায়ন হবে, তখন কবর শরীফ এবং দু সাহাবীর কবর যিয়ারত করবে। অর্থাৎ কবর যিয়ারতের বিষয়টি মসজিদে নববী যিয়ারতের উপর ভিত্তি করে হতে হবে। সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, « لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى» তিনটি মসজিদ ব্যতীত ইবাদতের উদ্দেশ্যে কোথায় সফর করা যাবে না। মসজিদে হারাম, আমার মসজিদ এবং মসজিদে আকসা।[2]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবর বা অন্য

1 . মাজমু ফাতাওয়া ১৬/১১১-১১৪।

2 . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ নারীদের হজ্জ। হা/১৮৬৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ তিনটি মসজিদ ব্যতীত সফর করা যাবে না। হা/১৩৯৭।

কারো কবরের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা যদি শরীয়ত সম্মত হত, তবে অবশ্যই তিনি তাঁর উম্মতকে এ বিষয়ে নির্দেশনা দিতেন এবং তার ফযীলত বর্ণনা করতেন। কেননা তিনি মানুষকে সবেচেয়ে বেশী নসীহত করেছেন, আল্লাহ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী জ্ঞান রাখতেন, সবচেয়ে বেশী তাঁকে ভয় করতেন। তিনি রিসালত সুস্পষ্টভাবে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর উম্মতকে যাবতীয় কল্যাণের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে সতর্ক করেছেন। অথচ তিনিই মানুষকে উক্ত তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন,

«لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»

"তোমরা আমার কবরকে ঈদ উৎসব স্থল বানায়ো না। আর তোমাদের গৃহগুলোকে কবরস্থান করো না। (গৃহেও মাঝে-মধ্যে সালাত আদায় করো) তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।"[1]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে জায়েয বললে, তাঁর কবরকে ঈদ উৎসব স্থল বানানো হল এবং যে সকল বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জনের আশংকা নবী

1 . ইমাম আহমাদ হাদীছটি আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ২/৩৬৭। আরো বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সুন্নাহ, অনুচ্ছেদঃ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। হা/২০৪২। তবে তাদের হাদীছের বাক্য ভিন্ন। অচিরেই তার বিবরণ উল্লেখ করা হবে।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করতেন সেই নিষিদ্ধ কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই গেল। যেমন অনেক মানুষ এ ধরণের নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে এই কারণে যে, তাদের বিশ্বাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা বৈধ হওয়ার পক্ষে যে সকল হাদীছ দিয়ে দলীল পেশ করা হয়, সেগুলোর সনদ দূর্বল অথবা হাদীছগুলো বানোয়াট। ঐ হাদীছগুলোর অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সতর্ক করেছেন হাদীছের হাফেযগণ। যেমন ইমাম দারাকুতনী, বাইহাকী, হাফেয ইবনে হাজার প্রমূখ।[1] অতএব সেগুলো দ্বারা সহীহ হাদীছের বিরোধিতা করা যাবে না। যাতে ঐ তিনটি মসজিদ ব্যতীত সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে যে সকল যঈফ ও বানোয়াট হাদীছ পেশ করা হয় পাঠকের জ্ঞাতার্থে নীচে তার কিছু নমূনা উল্লেখ করা হল। উদ্দেশ্য হচ্ছে তা জেনে সতর্ক থাকা এবং ধোকায় না পড়া।

(১) যে ব্যক্তি হজ্জ করবে, কিন্তু আমার যিয়ারত করবে না, সে আমার সাথে রূঢ় আচরণ করবে।[2]

(২) আমার মৃত্যুর পর যে আমার যিয়ারত করবে, সে যেন জীবিত অবস্থাতেই আমার যিয়ারত করল।[3]

1 . দেখুন, তালখীসুল হাবীর, হাফেয ইবনে হাজার ৩/৯০৪।

2 দেখুন, আল কামেল, ইবনু আদী ৮/২৪৮, আল ঈলাল- দারাকুতনী, দেখুন আদ দুররুল মানছূর ১/২৩৭।

3 দেখুন, দারাকুতনী নং ২৬৬৫।

(৩) যে ব্যক্তি একই বছর আমার কবর ও আমার পিতা ইবরাহীমের কবর যিয়ারত করবে, আমি তার জন্য আল্লাহর কাছে জান্নাতের জিম্মাদার হয়ে যাব।[1]

(৪) যে আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[2]

এই হাদীছগুলো বা এরকম আরো যে সমস্ত হাদীছ রয়েছে,তার কোন কিছুই নবী থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়নি।

হাফেয ইবনে হাজার তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে এ সংক্রান্ত অধিকাংশ রেওয়ায়াত উল্লেখ করে বলেন, এ হাদীছের সবগুলো সনদ যঈফ বা দূর্বল। হাফেয উকাইলী বলেন, এ সংক্রান্ত কোন হাদীছই সহীহ নয়।[3]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,এ হাদীছগুলো সবই জাল বা বানোয়াট।[4] তোমার একথা জানা ও মুখস্ত রাখা যথেষ্ট যে,এ সংক্রান্ত কোন কথা সঠিক থাকলে সাহাবায়ে কেরাম উক্ত আমল করার জন্য সবার আগে থাকতেন এবং মুসলিম জাতির জন্য তা বর্ণনা করতেন এবং মানুষকে আহবান জানাতেন। কেননা নবী-রাসূলদের পর তাঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহর সীমারেখা ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে সবেচেয়ে বেশী জ্ঞানী,আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলতে সবচেয়ে বেশী আগ্রহী এবং আল্লাহর সৃষ্টির জন্য সবেচেয়ে

1 হাদীছটি জাল বা বানোয়াট। যেমনটি বলেছেন ইমাম নববী। দ্রঃ আল মাজমূ ৭/২৬১। মাজমূ ফাতাওয়া শাইখুল ইসলাম ২৭/২৫।

2 দেখুন, আল কামেল, ইবনু আদী ৮/৬৯, আল ঈলাল- দারাকুতনী ২৬৫৮। উকাইলী, যোআফা গ্রন্থে ৪/১৭০।

3 দেখুন, তালখীসুল হাবীর, হাফেয ইবনে হাজার ৮/৯০৭, উকাইলী, যোআফা গ্রন্থে ৪/১৭০।

4 মাজমূ ফাতাওয়া, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ৭/২৫।

বেশী কল্যাণকামী। অতএব তাঁদের থেকে যখন এ ব্যাপারে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি,তখন একথা প্রমাণিত হল যে এগুলো শরীয়ত সম্মত নয়।

কোন কিছু যদি সহীহ হয়ও,তবে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে শরীয়ত সম্মত যিয়ারত। যাতে শুধু কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা হবে না। আর এভাবে উভয় প্রকার হাদীছের সাথে সামঞ্জস্য হবে। (আল্লাহই সঠিক জ্ঞান রাখেন)

استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع

মসজিদে কুবা ও বাকী গোরস্থান যিয়ারত করা মুস্তাহাব[1]

মদীনা শরীফ যিয়ারতকারীর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে মসজিদে কুবা যাওয়া এবং সেখানে সালাত আদায় করা। বুখারী ও মুসলিমে ইবনে ওমার (রাঃ)থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

«كَانَ النَّبِيّ ﷺ يَزُور مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ»

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কুবা যিয়ারত করতেন। কখনো উটে চড়ে যেতেন কখনো পায়ে হেঁটে যেতেন। অতঃপর সেখানে দু রাকাত সালাত আদায় করতেন।[2]

সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

« مَن تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ »

যে ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে পবিত্রতা অর্জন করবে,অতঃপর মসজিদে কুবায় গিয়ে দু রাকাত নামায আদায় করবে,তাকে একটি উমরার ছোয়াব দেয়া হবে।[3]

আরো মুস্তাহাব হচ্ছে বাকী গোরস্থান,শহীদদের কবর ও হামযা

---

1 দেখুন, মাজমু ফাতাওয়া ১৬/১১৪-১১৭।

2 দেখুন, বুখারী, অধ্যায়ঃ জুমআ, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে কুবায় যাওয়া হেঁটে অথবা বাহনে চড়ে হা/ ১১৯৪, মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে কবার ফযীলত হা/১৩৯৯।

3 দেখুন, ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ নামায কায়েম করা, অনুচ্ছেদঃ মসজিদে কুবায় নামাযের বিবরণ, হা/১৪১।

(রাঃ)এর কবর যিয়ারত করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের কবর যিয়ারত করতেন এবং তাঁদের জন্য দুয়া করতেন। তিনি এরশাদ করেছেন, «زُورُوا القُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ» তোমরা কবর যিয়ারত কর,কেননা কবর তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করাবে।[1] (মুসলিম)নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে কবর যিয়ারতের দুয়া শিক্ষা দিতেনঃ

« السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ»

আস সালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারে মিনাল মুমেনীনা ওয়াল মুসলিমীন। ওয়া ইন্না ইন শা আল্লাহু বিকুম লাহেকূন। নাস আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াহ।[2]

হে কবরের অধিবাসী মুমিন মুসলিমগণ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আমরা অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

ইমাম তিরমিযী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কিছু কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই দুয়াটি পড়লেনঃ

«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ»

---

1 মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ নবী (সা.)এর আল্লাহর কাছে অনুমতি প্রার্থনা তাঁর মায়ের কবর যিয়ারতের জন্য। হা/৯৭৬। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

2 মুসলিম, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ কবরস্থানে প্রবেশের সময় কি বলতে হয়। হা/৯৭৫। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

আস সালামু আলাইকু ইয়া আহলাল কুবূর,ইয়াগফেরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম, আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছারি।

হে কবরের অধিবাসীগণ,তোমার উপর শান্তি নাযিল হোক। আল্লাহ তোমাদের ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আমাদের অগ্রজ, আমরা তোমাদেরই অনুসরণ করব।[1]

এ থেকে জানা গেল, শরীয়ত সম্মত কবর যিয়ারত হচ্ছেঃ যিয়ারতের উদ্দেশ্য হবে আখেরাতকে স্মরণ করা, মৃতদের প্রতি ইহসান করা, তাদের জন্য দুয়া করা ও তাদের উপর রাহমত নাযিল হওয়ার আবেদন করা।

কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয়, কবরের কাছে গিয়ে দুয়া করলে দুয়া কবুল হবে, অথবা সেখানে কিছু সময় কাটানো এই উদ্দেশ্যে যে এটা পবিত্র স্থান, অথবা তাদের কাছে প্রয়োজন মেটানোর জন্য আবেদন করা, বা রোগ মুক্তির দরখাস্ত পেশ করা অথবা তাদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা ইত্যাদি তাহলে তা হবে বিদআতী যিয়ারত ও গর্হিত কাজ। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যার অনুমতি দেননি। সালাফে সালেহীনও তা করেননি। বরং এটা হাদীছে নিষিদ্ধ [খারাপ কথার] অন্তর্ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, « زُورُوا الْقُبُورَ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا » তোমরা কবর যিয়ারত কর, কিন্তু খারাপ কথা বলো না।[2]

যিয়ারতের উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলো নিঃসন্দেহে বিদআত তথা

1 তিরমিযী, অধ্যায়ঃ জানাযা, অনুচ্ছেদঃ কবরস্থানে প্রবেশ করলে কি বলতে হয়। হা/১০৫৩। কিন্তু হাদীছটি যঈফ।

2 আহমাদ ৩/২৩৭। মুয়াত্তা ইমাম মালেক অধ্যায়ঃ কুরবানী, অনুচ্ছেদঃ কুরবানীর গোস্ত জমা রাখার বর্ণনা। হা/১০৪৮। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

নবাড্ভাবিত বিষয়। কিন্তু প্রতিটির স্তর আলাদা আলাদা। কোনটি বিদআত কোনটি শিরক। যেমন কবরের কাছে গিয়ে আল্লাহর কাছে দুয়া করা, মৃত ব্যক্তি উসীলায় বা তার সম্মানের খাতিরে আল্লাহর কাছে দুয়া প্রভৃতি হচ্ছে বিদআত। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে সরাসরি আহবান করা,তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া প্রভৃতি হচ্ছে শিরকে আকবার বা বড় শিরক। আর বড় শিরক করলে মানুষ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

শিরকের এ বিষয়টি পূর্বে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব সাবধান সাবধান। তোমার পালনকর্তার কাছে হেদায়াত ও তাওফীকের প্রার্থনা কর। কেননা তিনিই একমাত্র হেদায়াতকারী, তিনি ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন পালনকর্তা ও মালিক নেই।

ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন।

وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم

হাজী সাহেব ও অন্যদের উপর আবশ্যক হল আমর বিল মারূফ করা।[1]

হাজী সাহেবদের উপর বিশাল যে কাজটি অত্যাবশকীয় তা হচ্ছে,আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা,পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের যত্ন নেয়া,জামাআতের সাথে যথাসময়ে আদায় করা। যেমনটি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর কিতাবের মাধ্যমে এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে।

কিন্তু মক্কা এবং অন্য জায়গার অধিবাসীরা যে মসজিদে না গিয়ে গৃহে নামায পড়ে, তাদের এ কাজ মারাত্মক ভুল এবং শরীয়তের খেলাফ। মানুষকে এ থেকে বাধা দেয়া উচিত এবং এ আদেশ করা দরকার যে, তারা যেন নামাযগুলোকে মসজিদে আদায় করতে যত্নবান হয়।

সহীহ হাদীছে এসেছে যে,আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) অন্ধ হওয়ার কারণে এবং বাড়ী মসজিদ থেকে দূরে হওয়ার কারণে যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে গৃহে নামায পড়ার অনুমতি চাইলেন, তখন নবীজী প্রশ্ন করলেন, «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ» তুমি কি নামাযের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহলে মসজিদে হাযির হওয়া ওয়াজিব।[2]

1 মাজমূ ফাতাওয়া ১৬/৯০।

2 মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ আযান শুনলে মসজিদে আসা

অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, তাহলে গৃহে নামায পড়ার জন্য আমি অনুমতি পাচ্ছি না।[1]

আরেক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَن آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَام، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنطَلِقُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاة فَأُحَرِّق عَلَيْهِم بِيُوتهم بِالنَّارِ»

আমি সংকল্প করছি যে সালাত কায়েম করার হুকুম দিব,তারপর একজন লোককে বলব মানুষের ইমামতি করতে। অতঃপর আমি উপস্থিত হব সেই সমস্ত পুরুষদের কাছে যারা সালাতের জামাআতে হাযির হয়নি,তারপর আগুন দিয়ে তাদেরসহ বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিব।[2]

ইবনে মাজাহ হাসান সনদে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «مَن سَمِعَ النِّدَاءَ، فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِن عُذْرٍ» যে বক্তি আযান শুনবে, অতঃপর মসজিদে হাযির হবে না, তবে ওযর না থাকলে তার নামায হবে না।[3]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

ওয়াজিব। হা/ ৬৫৩।

1 আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ সালাত, অনুচ্ছেদঃ জামাত পরিত্যাগকারীদের উপর কঠোরতা হা/৫২২। ইবনে মাজাহ, হা/৭৯২।

2 বুখারী, অধ্যায়ঃ ঝগড়া-ফাসাদ, অনুচ্ছেদঃ অপরাধী ও ঝগড়াকারীদের বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হা/২৪২০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ জামাতে নামাযের ফযীলত এবং জামাত ছাড়ার ব্যাপারে কঠোরতা হা/৬৫১

3 ইবনে মাজাহ অধ্যায়ঃ মসজিদ ও জামাআত, অনুচ্ছেদঃ জামাতে উপস্থিত না হলে কঠোরতা। হা/৭৯৩

"যে ব্যক্তি আগামীকাল (কিয়ামত দিবসে) মুসলিম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার আনন্দ পেতে চায়,সে যেন যখনই আযান দেয়া হবে তখনই এই নামাযগুলোর প্রতি যত্নবান হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্যে হেদায়েতের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এই নামাযগুলো হচ্ছে তাঁর হেদায়তের পথ। তোমরা যদি এই নামাযগুলো বাড়িতে আদায় কর যেমন জামাআত পরিত্যাগকারী এই ব্যক্তি নিজ বাড়ীতে নামায আদায় করে থাকে,তবে তোমরা তোমাদের নবীর অনুসরণ ছেড়ে দিলে। আর তোমরা যদি তোমাদের নবীর অনুসরণ ছেড়ে দাও তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

আর যখন কোন ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে এবং সুন্দর রূপে পবিত্রতার (ওযুর) কাজগুলো সম্পাদন করে,তারপর যে কোন একটি মসজিদের উদ্দেশ্যে গমন করে,তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি পদের জন্য একটি নেকী লিখে দেন,একটি মর্যাদা উন্নীত করেন এবং একটি গুনাহ মোচন করেন। আমরা দেখেছি আমাদের যুগে প্রকৃত মুনাফেক ছাড়া কেউ জামাআতে অনুপস্থিত থাকতো না। আমাদের মধ্যে অসুস্থ ব্যক্তিকেও দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে মসজিদে আনা হতো এবং নামাযের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো।[1]

হাজী সাহেব ও সকল মুসলিমদের উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর হারামকৃত বিষয় থেকে দূরে থাকা, তাতে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা। যেমন, ব্যভিচার, সমকামিতা, চুরি-ডাকাতী, সুদ-ঘুষ, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত, ধোকাবাজী, আমানতের খিয়ানত, মদ্যপান বা মাদকদ্রব্য সেবন, ধুমপান, পুরুষের টাখনুর নীচে কাপড়

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদঃ জামাআতের সাথে নামায হেদায়াতের পথ। হা/ ৬৫৪।

ঝুলিয়ে পড়া, অহংকার, হিংসা, রিয়া, গীবত, চুগলখোরী, মুসলিমদেরকে ঠাট্টা–বিদ্রূপ, গান–বাদ্য এবং তার সরঞ্জাম ব্যবহার যেমন ঢোল–তবলা, হারমুনিয়াম, বাঁশি ইত্যাদি। গান শোনা, পাশা খেলা, দাবা খেলা, জুয়া খেলা, প্রাণীর ছবি উঠানো, এগুলো সবই গর্হিত ও হারাম এবং এতে সন্তুষ্টি প্রকাশও হারাম। আল্লাহ এগুলো সকল যুগে সকল স্থানে সকল মানুষের উপর হারাম করেছেন।

অতএব এ সকল বিষয়ে সকল মুসলিমের সতর্ক থাকা জরুরী, বিশেষ করে হাজী সাহেব এবং মক্কার অধিবাসীদের অন্যদের চেয়ে সতর্ক থাকা বেশী জরুরী। কেননা এই সম্মানিত নিরাপদ শহরে পাপাচারের গুনাহ ও শাস্তি অন্য স্থানের চেয়ে কঠিন ও বেশী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

এখানে (মসজিদে হারামে) যে–ই সত্যতা থেকে সরে গিয়ে বেদ্বীনী ও জুলুমের পথ অবলম্বন করার ইচ্ছা পোষণ করবে, তাকেই আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ আস্বাদান করাবো। (সূরা হজ্জঃ ২৫)

অতএব মসজিদে হারামে এসে বেদ্বীনী ও জুলুমের ইচ্ছা পোষণ করলেই যদি আল্লাহ তাকে এই ধমকী দিয়ে থাকেন, তাহলে যে ব্যক্তি এরকম কিছু ঘটাবে তার শাস্তি কিরূপ হতে পারে? নিঃসন্দেহে তা হবে ভয়ানক ও কঠিন। অতএব সবধরণের অপরাধ থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

হাজী সাহেবগণ যতক্ষণ এই অপরাধগুলো থেকে সতর্ক না থাকবে, আল্লাহর যাবতীয় হারাম থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে না রাখবে, তাদের হজ্জ পূণ্যময় হবে না, গুনাহ সমূহের মার্জনা হবে

না।নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «مَن حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» যে ব্যক্তি হজ্জে গিয়ে স্ত্রী সহবাস, অশ্লীলতা ও ফাসেকী কাজ করবে না, সে হজ্জ থেকে ফিরে যাবে এমন নিস্পাপ হয়ে, যেভাবে তার মায়ের গর্ভ থেকে সে ভুমিষ্ট হয়েছিল।[1]

উক্ত পাপাচার ও গর্হিত কাজগুলোর চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছেঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা তথা মৃত মানুষকে (নবী, পীর, ওলী প্রভৃতি) আহবান করা, তাদের কাছে দুয়া করা, তাদের কাছে সাহায্য ও উদ্ধার কামনা করা, তাদের উদ্দেশ্যে নযর মান্নত করা ও পশু যবেহ করা এই আশায় যে তারা আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে, রোগ মুক্তির ব্যবস্থা করবে অথবা হারিয়ে যাওয়া মানুষকে হাযির করে দিবে। এগুলো সবই শিরকে আকবার, যা আল্লাহর হারামকৃত বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন। এ কাজগুলোই ছিল মুশরিকদের ধর্ম-কর্ম।

আল্লাহ তায়ালা রাসূল প্রেরণ করেছেন, কিতাব নাযিল করেছেন এই শিরককে প্রতিহত করার জন্যই। অতএব প্রত্যেক হাজী এবং প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব হচ্ছে শিরক থেকে সতর্ক থাকা। অতীতে শিরকে লিপ্ত হওয়ার মত অপরাধ ঘটে গেলে তা থেকে পূর্ণরূপে তাওবা করা আবশ্যক। তাওবা করে নতুন করে হজ্জের কার্যাদী শুরু করা অপরিহার্য। কেননা শিরক সকল আমলকে বাতিল করে দেয়। আল্লাহ বলেন,

---

1 . বুখারী, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ মাবরূর হজ্জের ফযীলত হা/১৫২১। মুসলিম, অধ্যায়ঃ হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ হজ্জ, উমরা ও আরাফাতের ফযীলত, হা/১৩৫০।

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তারা যদি শিরক করত, তবে তাদের যাবতীয় আমল বরবাদ হয়ে যেত। (আনআমঃ ৮৮)

আর ছোট শিরকের উদাহরণ হচ্ছেঃ গাইরুল্লাহর নামে কসম বা শপথ করা। যেমন নবী, কাবা, প্রভৃতির নামে শপথ করা।

রিয়া ও শ্রুতির উদ্দেশ্যে আমল করা। আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান বলা। আল্লাহ এবং আপনি যদি না থাকতেন বলা। এটা আল্লাহর এবং আপনার পক্ষ থেকে বলা ইত্যাদি। এগুলো সবই শিরকী গর্হিত কাজ। এ থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক এবং বর্জন করার জন্য পরস্পরকে নসীহত করা উচিত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, « مَن حَلَفَ بِغَيْرِ الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত কারো নামে কসম খাবে বা শপথ করবে, সে কুফরী করবে বা শিরক করবে।[1]

ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «مَن كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ» কারো যদি হলফ (কসম) করার দরকার পড়ে, সে যেন আল্লাহর নামেই কসম করে নতুবা নীরব থাকে।[2]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, « مَن حَلَفَ

---

1 আহমাদ, ২/৭৬, ১২৫। আবু দাউদ, হা/৩২৫৩। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ নযর ও কসম অনুচ্ছেদঃ গাইরুল্লাহর নামে কসম করা নিষেধ, হা/১৫৩৫।

2 বুখারী, অধ্যায়ঃ স্বাক্ষ্য, অনুচ্ছেদঃ কিভাবে কসম করাবে। হা/২৬৭৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ কসম, অনুচ্ছেদঃ গাইরুল্লাহর নামে কসম করা নিষেধ, হা/১৬৪৬।

«بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» যে আমানতের নামে কসম করবে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[1]

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ». فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: «الرِّيَاءُ» আমি যে বিষয়ে তোমাদের ক্ষতির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী আশংকা করি তা হচ্ছে শিরকে আসগার বা ছোট শিরক। তাঁকে প্রশ্ন করা হল (উহা কি?) তিনি বললেন, রিয়া।2

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, তোমরা এরূপ বল না যে, আল্লাহ যা চায় এবং উমুক যা চায়। বরং বলবে, আল্লাহ যা চান অতঃপর উমুক যা চায়।[3]

ইমাম নাসাঈ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, «أَجَعَلْتَنِي لله نِدًّا ، بَلْ مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ» তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে দিলে? বরং বলবে, এককভাবে আল্লাহ যা চান তাই হবে।4

এ সকল হাদীছ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের অধিকারকে সংরক্ষণ করার জন্য

---

1 আহমাদ, ৫/৩৫২। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কসম ও মানত, অনুচ্ছেদঃ আমানতের নামে কসম করা নিষেধ। হা/৩২৫৩।

2 আহমাদ, ৫/৪২৮। মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

3 আহমাদ, ৫/৩৮৪। হুযায়ফা (রাঃ)থেকে বর্ণিত। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ আমি খবীছ হয়ে গেছি এরূপ কথা না বলা, হা/৪৯৮০।

4 আহমাদ, ৫/৩৯২।

কত সচেষ্ট ছিলেন। কিভাবে তাঁর উম্মতকে ছোট-বড় শিরক থেকে সতর্ক করেছেন। মানুষের ঈমান যেন নিরাপদ থাকে এবং তারা আল্লাহর গযব ও আযাব থেকে মুক্তি লাভ করে, তার প্রতি আগ্রহী ছিলেন।

তাই এ সকল কারণে আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি আল্লাহর রিসালত যথাযথভাবে পৌঁছিয়েছেন, মানুষকে সতর্ক করেছেন। আল্লাহর বান্দাদের নসীহত করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত অবিরাম নাযিল হোক তাঁর উপর দরূদ ও সালাম।

হাজীদের মধ্যে যারা বিদ্বান তাদের উপর এবং মক্কা-মদীনায় বসবাসকারীদের উপর আবশ্যক হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর শরীয়ত সম্পর্কে তালীম দেয়া, যে সকল শিরক ও পাপাচার আল্লাহ হারাম করেছেন, তা থেকে জনগণকে সতর্ক ও সাবধান করা। বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ সকল বিষয় পরিস্কারভাবে খোলাখোলি বর্ণনা করে দেয়া, যাতে মানুষ জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে ঈমানের পথ লাভ করতে পারে। আর এভাবেই তাদের উপর তাবলীগের যে দায়িত্ব আল্লাহ অর্পণ করেছেন তা তারা আদায় করতে পারেব।

আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

যখন আল্লাহ অঙ্গিকার নিয়েছিলেন তাদের থেকে যাদেরকে কিতাব দিয়েছেন, মানুষের নিকট কিতাবের শিক্ষাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিবে, কোন কিছুই গোপন করবে না। (আল ইমরানঃ ১৮৭)

এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, উম্মতের উলামাদের সতর্ক করা আহলে কিতাবদের পন্থা অনুসরণ না করার ব্যাপারে। যাদের চরিত্র ছিল সত্য গোপন করা এবং আখেরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

নিশ্চয় যারা আমার অবতীর্ণ উজ্জ্বল শিক্ষাবলী ও বিধানসমূহ গোপন করে,অথচ সমগ্র মানবতাকে পথের সন্ধান দেবার জন্য আমি সেগুলো আমার কিতাবে বর্ণনা করে দিয়েছি,জেনে রাখো, আল্লাহ তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং সকল অভিশাপ বর্ষণকারীরাও তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে। তবে যারা এই নীতি পরিহার করে, নিজেদের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং যা কিছু গোপন করে যাচ্ছিল সেগুলো বিবৃত করতে থাকে, তবে তাদেরকে আমি ক্ষমা করে দেবো আর আসলে আমি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (বাকারাঃ ১৫৯-১৬০)

কুরআনের অনেক আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর অনেক হাদীছ একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পথে দাওয়াত এবং মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার তালীম দেয়া, আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম উপায় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এটাই নবী-রাসূল ও কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসারীদের পথ। আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ঐ ব্যক্তির চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান করে এবং সৎ আমল করে ও বলে যে নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। (হা মীম সাজদাহঃ ৩৩)

আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ هَـذِهِ سَـبِيلِي أَدْعُـو إِلَـى اللَّهِ عَلَـى بَـصِيرَةٍ أَنَـا وَمَـنِ اتَّبَعَنِـي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাওঃ আমার পথ তো এটাই, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি,পরিপূর্ণ জ্ঞানসহকারে আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং শিরককারীদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (ইউসুফঃ ১০৮)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, « مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখাবে, সে (ঐ কল্যাণের উপর) আমলকারীর ন্যায় ছোয়াব লাভ করবে।[1] (মুসলিম)

তিনি আলী (রাঃ) কে বলেছেন, «لأَنْ يُهْدَيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ» তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন লোককেও হেদায়াত করেন, তবে তা তোমার জন্য একটি লাল উট

1 মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইমারত, অনুচ্ছেদঃ গাযীকে সাহায্য করার ফযীলত, হা/১৮৯৩। আবু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

পাওয়ার চেয়েও উত্তম।[1] মুত্তাফাকুন আলাইহি।

অতএব আল্লাহর পথে দাওয়াতী কাজের প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধি করার ব্যাপারে আলেমগণই উপযুক্ত মানুষ। তারাই মানুষকে নাজাতের পথ দেখাবে, ধ্বংসের পথ থেকে সতর্ক করবে। বিশেষ করে এই শেষ যুগে, যখন মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণে মত্ত। যখন ধ্বংসাত্মক নীতি সম্প্রচার হচ্ছে, বিভ্রান্তিকর দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হচ্ছে। সঠিক পথের দিকে আহবানকারীর সংখ্যা কম, কিন্তু কুফরী ও অশ্লীলতার পথের দিকে আহবানকারীর সংখ্যাই বেশী। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত কারো কোন উপায় নেই।

1 বুখারী, অধ্যায়ঃ জিহাদ, অনুচ্ছেদঃ নবী সা.এর দুয়া, হা/২৯৪২। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ইমারত, অনুচ্ছেদঃ গাযীকে সাহায্য করার ফযীলত, হা/১৮৯৩। সাহল বিন সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

বিভিন্ন সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় অর্জন করা কর্তব্য

মক্কা শরীফে অবস্থানকালে হাজীগণের জন্য আল্লাহর যিকির, তাঁর আনুগত্য ও সৎকাজসমূহ সম্পাদনে সর্বদা নিয়োজিত থাকা এবং বেশি বেশি নামায পড়া ও বায়তুল্লাহ শরীফের ত্বায়াফ করা। কেননা, হারাম শরীফে সম্পাদিত নেক আমলের সওয়াব অনেকগুণ বেশি এবং খারাপ কাজের পরিণতি অত্যন্ত গুরুতর। এভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি হাজীদের অধিক মাত্রায় দরূদ ও সালাম পাঠ করা অতি উত্তম কাজ।

অত:পর হাজীগণ যখন মক্কা শরীফ হতে বের হওয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন তাদের জন্য বায়লাতুল্লাহ শরীফের বিদায়ী ত্বাওয়াফ করা ওয়াজিব। যাতে এই ত্বাওয়াফের মাধ্যমে বায়তুল্লাহর সাথে তাদের সর্বশেষ অবস্থান হয়ে থাকে।

তবে এই নির্দেশ ঋতুবতী ও সন্তান প্রসব হওয়া স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তাদের উপর বিদায় তাওয়াফ নেই, তার দলীল আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস। তিনি বলেন:

« أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ».

অর্থ: "লোকদের হুকুম দেয়া হয়েছে তাদের শেষ অবস্থানটি যেন বায়তুল্লাহর ত্বাওয়াফের মাধ্যমে হয়; কিন্তু ঋতুবতী নারীর জন্য এই বিষয়টি শীথিল করা হয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

এরপর যখন হাজী সাহেব বায়তুল্লাহ শরীফের বিদায়ী ত্বাওয়াফ সমাপ্ত করে মাসজিদুল হারাম থেকে বের হতে চাইবে তখন সম্মুখ দিকে মুখ করেই হেঁটে বের হবে। বায়তুল্লাহর দিকে মুখ রেখে উল্টো পায়ে অর্থাৎ পিছপা হেঁটে বের হওয়া ঠিক নয়। কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বা তাঁর সাহাবাগণ হতে এরূপ করার কোন প্রমাণ সাব্যস্ত হয়নি; বরং তা নবপ্রবর্তিত বিদ‘আত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর বিদ‘আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সতর্ক করে বলেন:

« مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا ، فَهُوَ رَدٌّ »

অর্থ: “যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করল যার প্রতি আমাদের শরীয়তের কোন অনুমোদন নেই, তা বাতিল।”

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন:

« إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ »

অর্থ: “নতুন নতুন প্রবর্তিত বিষয়াদি হতে তোমরা দূরে থাক; কেননা, প্রত্যেকটি নতুন প্রবর্তিত বিষয় বিদ আত এবং প্রত্যেকটি বিদ‘আতই ভ্রষ্টতা।”

আল্লাহ তায়ালার নিকট তাঁর দ্বীনের উপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং এর পরিপন্থী যাবতীয় বিষয় থেকে নিরাপদ থাকার তাওফীক কামনা করি। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত দানশীল মহৎ।

مشروعية السَّلام بدءًا وإجابة
وتشميت العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض.

সালাম ও সালামের জবাব, হাঁচির জবাব এবং রোগির সুশ্রূষা[1]

১) আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে প্রশ্ন করল,ইসলামের কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম?

তিনি বললেঃ «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَن عَرَفْتَ وَمَن لَمْ تَعْرِفْ» "অভুক্তকে খানা খাওয়াবে এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দিবে।"[2]

২) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«لَا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ»

"তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত ঈমানদার না হবে। ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমরা পরস্পরকে

---

1 . মাজমু ফাতাওয়া ২৬/৪৯-৫২।

2 . বুখারী, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ খাদ্য প্রদান ইসলামের কাজ, হা/১২। মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ ইসলামের কোন বিষয় উত্তম, হা/৩৯।

ভাল না বাসবে। আমি কি তোমাদেরকে একটি বিষয় বলে দিব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে? তোমরা পরস্পরের মাঝে সালামের প্রসার ঘটাবে।”[1]

৩)আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ»

‘এক মুসলিমের উপর আরেক জনের পাঁচটি হক রয়েছেঃ (১) সালামের জবাব দেয়া,(২) হাঁচির জবাব দেয়া।(অর্থাৎ–হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।) (৩) দাওয়াত কবুল করা (৪) রোগীর শুশ্রূষা করা এবং (৫) জানাযায় অংশ নেয়া।[2]

৪) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “এক মুসলিমের উপর আরেক মুসলমানের ছয়টি বিষয় ওয়াজিব। প্রশ্ন হল,সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল!? তিনি বললেন,

«إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ»

---

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, হা/৫৪।

2 . বুখারী, অধ্যায়ঃ জানাযা,অনুচ্ছেদঃ জানাযার অনুসরণ করা, হা/১২৪০। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ সালামের জবাব দেয়া এক মুসলিমের উপর আরেক জনের অধিকারহা/২১৬২।

(১) সাক্ষাত হলে সালাম দিবে,(২) দাওয়াত দিলে কবুল করবে,(৩) কোন বিষয়ে পরামর্শ চাইলে উত্তম পরামর্শ দিবে। (৪) হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে তার জবাব দিবে (ইয়ারহামুকাল্লাহ),(৫) অসুস্থ হলে সুশ্রূষা করবে,(৬) মৃত্যু বরণ করলে তার জানাযায় অংশ নিবে।[1]

৫) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

নিশ্চয় হাঁচি পছন্দ করেন, হাই অপছন্দ করেন। হাঁচি আসলে বলবে আল হামদুলিল্লাহ। যে মুসলিম এটা শুনবে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে, জবাব দিবে (বলবে, ইয়ারহামুকাল্লাহ)। আর হাই হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব হাই আসলে সাধ্যানুযায়ী প্রতিহত করবে। হাই তোলার সময় হা বললে, শয়তান হাসে।[2]

৬) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। অতএব হাই আসলে সাধ্যানুযায়ী আটকিয়ে দিবে।[3]

৭) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

---

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ সালামের জবাব দেয়া এক মুসলিমের উপর আরেক জনের অধিকার, হা/২১৬২।

2 . বুখারী, অধ্যায়ঃ আদব অনুচ্ছেদঃ হাঁচির সময় কি মুস্তাহাব, হাই উঠলে করণীয় হা/৬২২৩।

3 . বুখারী, অধ্যায়ঃ সৃষ্টির সূচনা,অনুচ্ছেদঃ ইবলিস এবং তার সৈনিকদের বিবরণ, হা/৩১১৫। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যুহদ,অনুচ্ছেদঃ হাঁচির জবাব দেয়া এবং হাই অপছন্দনীয়, হা/২৯৯৪।

«إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»

তোমাদের কেউ হাই উঠালে যেন মুখে হাত দিয়ে বাধা দেয়। কেননা তখন শয়তান ভিতরে প্রবেশ করে।[1]

৮) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে বলবে, الحَمْدُ لِله আল হামদুলিল্লাহ। যে শুনবে সে তার ভাইয়ের হাঁচির জবাবে বলবে, يَرْحَمُكَ الله ইয়ারহামুকাল্লাহ। ইয়ারহামুকাল্লাহ বললে, যে হাঁচি দিয়েছিল জবাবে সে আবার বলবে, يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ইয়াহদিকুমুল্লাহু ওয়া ইউসলেহু বালাকুম।[2]

৯) আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আল হামদুলিল্লাহ বললে, তোমরা তার জবাব দাও। তবে আল হামদুলিল্লাহ না বললে কোন জবাব দিবে না।[3]

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ যুহদ,অনুচ্ছেদঃ হাঁচির জবাব দেয়া এবং হাই অপছন্দনীয়, হা/২৯৯৫।

[2] . বুখারী,অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ কিভাবে হাঁচির জবাব দিবে,হা/৬২২৪।

[3] . মুসলিম,অধ্যায়ঃ যুহদ,অনুচ্ছেদঃ হাঁচির জবাব দেয়া এবং হাই অপছন্দনীয়, হা/২৯৯২।

দুয়া ও যিকির

الأذكار والأدعية

ما يشرع من الذِّكر والدُّعاء عند النوم واليقظة

নিদ্রার সময় ও নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে যে দুয়া ও যিকির পড়তে হয়ঃ[1]

১) হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে শয্যা গ্রহণ করলে তাঁর গণ্ডের নীচে হাত রেখে শুইতেন, তারপর এই দুয়া পড়তেনঃ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا হে আল্লাহ তোমার নামে মৃত্যু বরণ করছি, তোমার নামেই জীবিত হব। যখন নিদ্রা থেকে উঠতেন পাঠ করতেন, الحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর নামে যিনি মৃত্যু দেয়ার পর আমাদেরকে জীবিত করেছেন। তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।[2]

ইমাম মুসলিমও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।[3]

---

[1] . মাজমু ফাতাওয়া ২৬/৩৮-৪৩

[2] . বুখারী,অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় কি দুয়া বলবে,হা/৬৩১২। হাদীছটি আবু যার থেকেও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন, হা/৬৩২৫।দী

[3] . মুসলিম,অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও তাওবা, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় ও শয্যা গ্রহণ করলে

২)আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, তাঁর দুহাতকে একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং এই সূরাগুলো পড়তেন। **(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) وَ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)** (১) কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, (২) কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও (৩) কুল আউযু বিরাব্বিন নাস। তারপর দুহাত দ্বারা সারা শরীরে যতদূর হাত যায় মাসেহ করতেন। প্রথমে মাথা এবং মুখমণ্ডল তারপর শরীরের সামনের দিকে হাত মাসেহ করতেন। আর এরূপ করতেন তিনবার।[1]

৩) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক রাত যাকাতের সম্পদ পাহারা দেয়ার জন্য আবু হুরাইরা (রাঃ)কে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, এক রাতে একজন লোক এসে নিজের অঞ্জলি ভর্তি করে নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। কিন্তু প্রতিবারই কাকুতী-মিনতী করার কারণে ছেড়ে দিলাম। যখন তৃতীয় রাতে আমি তাকে পাকড়াও করলাম, বললামঃ অবশ্যই আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট নিয়ে যাব। সে বলল,আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিব। তা দ্বারা আল্লাহ আপনাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম সেটা কি? সে বলল,যখন আপনি

কি দুয়া পড়বে,হা/২৭১০।

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ মুআববেযাতের ফযীলত, হা/৫০১৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ সালাম, অনুচ্ছেদঃ মুআববেযাতাইন দ্বারা রোগীর ঝাড়-ফুঁক, হা/২১৯২।

শয্যা গ্রহণ করবেন তখন পাঠ করবেন আয়াতুল কুরসী (আল্লাহু লা- ইলাহা ইল্লা হুওয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম..) আয়াতের শেষ পর্যন্ত। তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত করা হবে এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার নিকটবর্তী হতে পারবে না।

তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ,সে তোমাকে একটি সত্য কথা বলেছে কিন্তু সাবধান সে বড় মিথ্যুক। সে ছিল শয়তান।[1]

৪) আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

« مَن قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِن آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ »

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষের দুটি আয়াত পাঠ করবে, (সকল অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য) আয়াত দুটি তার জন্য যথেষ্ট হবে।[2]

৫) বারা বিন আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করবে। তারপর ডান কাতে শুয়ে এই দুয়াটি পড়বেঃ

---

[1] . বুখারী, (প্রায় একই ভাষায়) অধ্যায়ঃ কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ সূরা বাকারার ফযীলত, হা/৫০১০।

[2] . বুখারী, অধ্যায়ঃ কুরআনের ফযীলত, অনুচ্ছেদঃ সূরা বাকারার ফযীলত, হা/৫০০৯। মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সালাত ও কসর, অনুচ্ছেদঃ ফাতিহা ও বাকারার শেষ দুটি আয়াতের ফযীলত, হা/৮০৭।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ

হে আল্লাহ তোমার কাছে আমার প্রাণকে সমর্পণ করছি। আমার মুখমণ্ডলকে তোমার সম্মুখে পেশ করছি। আমার যাবতীয় বিষয় তোমার কাছে সমর্পন করছি। আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার কাছে পেশ করছি। তোমার কাছেই আশা পোষণ করছি এবং তোমাকেই ভয় করছি। তোমার আযাব থেকে বাঁচার জন্য তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই, নেই কোন মুক্তির ঠিকানা। তুমি যে কিতাব নাযিল করেছ তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং ঈমান এনেছি যে নবী তুমি পাঠিয়েছ তাঁর উপর।

তিনি বলেন, তুমি যদি সেই রাতে মৃত্যু বরণ কর, তবে ফিতরাতের উপর তথা ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করবে। আর এই দুয়াটি যেন তোমার শেষ কথা হয়।[1]

৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন এই দুয়াটি পাঠ করতেন,

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ ওযু, অনুচ্ছেদঃ যে ওযু অবস্থায় রাত কাটাবে। হা/২৪৭। মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় বলবে, হা/২৭১০।

وَالفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ

হে আল্লাহ! আকাশ মণ্ডলীর পালনকর্তা, পৃথিবীর পালনকর্তা, মহান আরশের পালনকর্তা। আমাদের পালনকর্তা, সকল বস্তুর পালনকর্তা। তুমি বীজ ও আঁটি অঙ্কুরকারী, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন নাযিলকারী। তুমিই অনাদি তোমার পূর্বে কেউ নেই। তুমিই অনন্ত তোমার পর কেউ নেই। তুমিই প্রকাশ্য তোমার উপরে কেউ নেই। তুমিই গোপন তোমার পরে কিছু নেই। আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং দরিদ্রতা থেকে রক্ষা কর।[1]

৭) উম্মুল মুমেনীন হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, ডান হাতকে ডান গণ্ডের নীচে রেখে বলতেন,

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

হে আল্লাহ!তোমার বান্দাদের যেদিন পুনরুত্থান করবে, তোমার শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা কর।

দুয়াটি তিনবার বলতেন। (আহমাদ ও আবু দাউদ, সনদ হাসান)[2]

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় বলবে, হা/২৭১৩।

[2] . আহমাদ, ৬/২৮৭, ২৮৮। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় যে দুয়া বলবে, হা/ ৫০৪৫। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদ নং ১৮, শয্যা গ্রহণ করলে যে দুয়া পড়বে। হা/৩৩৯৮, ৩৩৯৯।

৮)আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করতেন এই দুয়াটি পাঠ করতেন,

الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُئْوِيَ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূরণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দান করেছেন। এমন অনেক লোক আছে যাদের প্রয়োজন পূরণকারী কেউ নেই এবং আশ্রয়দানকারীও কেউ নেই'।[1]

৯) ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি জনৈক লোককে শয্যা গ্রহণ করার সময় এই দুয়াটি পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন,

اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا إِن أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِن أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ

হে আল্লাহ!তুমি সৃষ্টি করেছ, তুমি তাকে মৃত্যু দিবে। তোমার হাতেই আমার প্রাণের জীবন ও মৃত্যু। তাকে জীবিত রাখলে হেফাযত কর এবং মৃত্যু দান করলে ক্ষমা করে দিও। হে আল্লাহ তোমার কাছে নিরাপত্তা চাই।[2]

১০) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন যেন নিজের লুঙ্গির ভিতর অংশ

---

[1] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় বলবে, হা/২৭১৫।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় বলবে, হা/২৭১২।

দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা সে জানে না বিছানা ত্যাগ করার পর সেখানে কিছু আছে কি না। শুইতে চাইলে যেন ডান কাতে শয়ন করে আর এই দুয়াটি পড়েঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِن أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِن أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি হে আল্লাহ্! তুমি আমার পালনকর্তা, তোমার নামে আমার পার্শ্বদেশ বিছানায় রাখছি। তোমার নামেই তা উঠাবো। তুমি যদি নিদ্রাবস্থায় আমার জান কবজ কর, তবে তাকে ক্ষমা কর। আর যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখ তবে তাকে সেভাবেই হেফাযত কর যেভাবে তোমার নেক বান্দাদের হেফাযত করে থাক।[1]

১১) আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা ফাতিমা (রাঃ) একটি খাদেম চাওয়ার উদ্দেশ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে গেলেন কিন্তু তাঁকে পেলেন না। আয়েশা (রাঃ)কে পেয়ে তাঁর আগমণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এলে আয়েশা (রাঃ) ফাতিমার আগমণ সম্পর্কে তাঁকে জানালেন।

আলী (রাঃ) বলেন, একথা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদ নং ১৩, হা/৬৩২০ এবং অধ্যায়ঃ তাওহীদ, অনুচ্ছেদঃ আল্লাহর নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করা। হা/৭৩৯৩। মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় বলবে, হা/২৭১৪।

সাল্লাম) আমাদের নিকট আগমণ করলেন। তখন আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। তাঁকে দেখে আমরা উঠতে চাইলাম। তিনি বললেন, শুয়ে থাক। তিনি আমাদের দু'জনের মধ্যবর্তী স্থানে বসে পড়লেন এমনকি তাঁর পায়ের ঠাণ্ডা আমার সিনায় অনুভব করলাম। তারপর তিনি বললেনঃ

'তোমরা যা চেয়েছো আমি কি তোমাদেরকে তার চেয়ে উত্তম কিছু শিখিয়ে দিব না? তোমরা যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করবে,এগুলো তোমাদের জন্য একজন খাদেমের চেয়ে উত্তম।[1]

আলী (রাঃ) বলেন, একথাগুলো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর নিকট থেকে শেখার পর আমি কখনই তা পাঠ করতে ছাড়িনি।[2]

১২) উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

'যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে এই দু'আটি পাঠ করবেঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ للهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রার সময় তাকবীর ও তসবীহ পাঠ। হা/৬৩১৮। মুসলিম, অধ্যায়ঃ দুয়া, যিকির ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ দিনের প্রথমাংশে ও নিদ্রার সময় দুয়া ও যিকির পাঠ, হা/২৭২৭।

[2] . আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, হা/৫০৬০। ঐ হাদীছে আরো আছে, তিনি বলেন, তবে সিফফীনের যুদ্ধের রাতে এগুলো পড়তে ভুলে গেছিলাম। শেষ রাতে যখন স্মরণ হয়, তখনই তা পড়ে ফেলি।

أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

‘আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য,অতি পবিত্র আল্লাহ্ তা’আলা, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ্ মহান। আল্লাহর শক্তি ও সামর্থ ছাড়া কোন উপায় নেই’।

তারপর সে যদি বলেঃ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা কর। অথবা কোন দু’আ করে,তবে তা কবূল করা হবে। যদি ওযু করে অতঃপর নামায আদায় করে,তবে তার নামায কবূল করা হবে’।[1]

[1] . বুখারী,অধ্যায়ঃ তাহাজ্জুদ, অনুচ্ছেদঃ নিদ্রা থেকে জেগে যে সালাত আদায় করে। হা/১১৫৪।

أذكار الصَّباح والمساء

সকাল-সন্ধ্যার যিকির[1]

১) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় একশত বার করে পাঠ করবে سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ (সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি) তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে কিয়ামত দিবসে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তার মত আমল করবে বা তার চেয়ে বেশী বলবে।"[2]

২) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সন্ধ্যা হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দুয়াটি পড়তেন,

« أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ لله، وَالحَمْدُ لله، لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ »

আমরা সন্ধ্যায় উপণীত হয়েছি, সারা পৃথিবী সন্ধ্যায় আল্লাহর কাছে উপণীত হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া

---

[1] . মাজমু ফাতাওয়া ১৬/৬৯-৭৩।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির দুয়া ও ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ তাহলীল ও তাসবীহর ফযীলত, হা/২৬৯২।

কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব,তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ তোমার নিকট এই রাতের কল্যাণ চাই এবং তার পরবর্তী সময়ের কল্যাণ চাই। এই রাতের অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং তার পরবর্তী সময়ের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। হে প্রভু! অলসতা ও বার্ধক্যের খারাপ অবস্থা থেকে আশ্রয় চাই। হে প্রভু জাহান্নামের আযাব ও কবরের আযাব থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

যখন সকল হত তিনি বলতেন, আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ...

৩) শাদ্দাদ বিন আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার হচ্ছে,বান্দা এই দু'আ পাঠ করবেঃ

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

'হে আল্লাহ্ তুমি আমার প্রভু প্রতিপালক,তুমি ছাড়া ইবাদত যোগ্য কোন ইলাহ্ নেই,তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা-অঙ্গিকার রক্ষা করছি। আমার কৃত কর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি,আমার প্রতি তোমার নেয়া'মত স্বীকার করছি এবং তোমার দরবারে আমার পাপের স্বীকারোক্তি দিচ্ছি। সুতরাং তুমি আমায় ক্ষমা কর,কেননা তুমি ছাড়া পাপরাশী কেহই ক্ষমা করতে পারে না'।

যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় দৃঢ় বিশ্বাস রেখে উহা পাঠ করবে,যদি রাতের মধ্যে মৃত্যু হয়,তবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি সকালে দৃঢ় বিশ্বাস রেখে উহা পাঠ করে এবং দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়,তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[1]

৪) আবদুল্লাহ্ বিন খুবাইব হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,একদা বৃষ্টিময় কঠিন অন্ধকার রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর অনুসন্ধান করার জন্য বের হলাম। যাতে করে তিনি আমাদেরকে নামায পড়ান। তিনি বলেন,আমরা তাঁকে পেয়ে গেলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, বল, আমি কিছুই বললাম না। তারপর তিনি বললেন, বল, এবারও আমি কিছুই বললাম না। তিনি বললেন, বল, আমি বললাম, কি বলব? তিনি বললেন, 'যখন সন্ধ্যা হবে তখন তিনবার পাঠ করবে (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) এবং মুআব্বেযাতাইন। তাহলে ইহা সব কিছু থেকে (সব কিছুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে) তোমার জন্য যথেষ্ট হবে'।[2]

৫) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু কথা শিক্ষা দিন, যা আমি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করব। তিনি বললেন, এই দুয়াটি পাঠ করবেঃ

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদঃ ইস্তেগফারের ফযীলত, হা/৬৩০৬।

[2] . তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু আ, অনুচ্ছেদঃ বিপদোদ্ধার প্রভৃতির অপেক্ষা করা। হা/ ৩৪৯৯। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব-শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদঃ প্রভাতে কি পাঠ করবে। হা/ ৪৪১৯। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ আশ্রয় প্রার্থনা, হা/ ৫৩৩৩। হাদীছটি আলবানী হাসান বলেন, ছহীহ তিরমিযী হা/ ৩৫৭৫। ছহীহ আবু দাউদ, হা/ ৫০৮২।

كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ » [«وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ »

'হে আল্লাহ্ তুমি আসমান-যমিনের সৃষ্টিকর্তা,তুমি গোপন-প্রকাশ্য সবকিছুই জান। তুমি সকল বস্তুর প্রভু এবং সব কিছুর মালিক,আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট থেকে। আর আশ্রয় কামনা করছি নিজের উপর অন্যায় করা থেকে বা সে অন্যায় কোন মুসলিমের উপর চাপিয়ে দেয়া থেকে'। তিনি বলেন, সকালে ও সন্ধ্যায় এবং রাতে যখন শয্যা গ্রহণ করবে, তখন এই দুয়াটি পাঠ করবে।[1]

৬)উছমান বিন আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

'কোন বান্দা যদি প্রতিদিন সকালে এবং প্রতি রাতের সন্ধ্যায় এই দুয়াটি তিনবার করে পাঠ করেঃ

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ

অর্থঃ 'শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে,যার নামের সাথে আসমান এবং যমীনের কোন বস্তুই কোন ক্ষতি করতে পারবে না,তিনি

---

[1] . আহমাদ, ১/১৪। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব-শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদঃ প্রভাতে কি পাঠ করবে। হা/ ৫০৬৭। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু আ, অনুচ্ছেদঃ বিপদোদ্ধার প্রভৃতির অপেক্ষা করা। হা/ ৩৫২৯। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ আশ্রয় প্রার্থনা, হা/ ৭৬৯৯।

মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী'। তাহলে কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না'।[1]

৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর খাদেম ছাওবান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন বান্দা যদি সকালে এবং সন্ধ্যায় তিনবার এই দুয়াটি পাঠ করেঃ

رَضِيتُ بِالله رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا

'আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহকে প্রভু,ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে নবী হিসেবে'। তাহলে আল্লাহর উপর আবশ্যক হয়ে যাবে, কিয়ামত দিবসে তিনি ঐ বান্দাকে সন্তুষ্ট করে দিবেন।[2]

৮) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বলবে,

رَضِيتُ بِالله رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا

'আমি সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি আল্লাহকে প্রভু, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে নবী হিসেবে'। তবে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে।[3]

---

1 . আহমাদ, ১/৬২, ৬৬, ৭২। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু আ, অনুচ্ছেদঃ সকাল-সন্ধ্যার দুয়া। হা/ ৩৩৮৮। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ দু আ, অনুচ্ছেদঃ সকাল-সন্ধ্যা মানুষ কি দুয়া পড়বে। হা/ ৩৮৬৯।

2 . আহমাদ, ৪/৩৩৭। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া বলবে। হা/ ৫০৭২। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদঃ সকাল-সন্ধ্যার দুয়া। হা/ ৩৩৮৯। ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ দু'আ, অনুচ্ছেদঃ সকাল-সন্ধ্যায় মানুষ কি দুয়া পড়বে। হা/ ৩৮৭০।

3 . মসুলিম, অধ্যায়ঃ ইমারত, অনুচ্ছেদঃ মুজাহিদের জন্য আল্লাহ জান্নাতে যা তৈরী

৯) আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানের স্বাদ পেয়েছে সে, যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে।[1]

১০) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় পাঠ করবেঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহতু, উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরশিকা,ওয়া মালা-ইকাতাকা ওয়া জামীআ' খালক্বিকা, বি আন্নাকা আন্তাল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ্ তোমার নামে আমি সকাল করেছি। তোমাকে সাক্ষি রাখছি,তোমার আরশ বহন কারী ফেরেশতা,ফেরেশতাকুল এবং তোমার সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সাক্ষি রেখে বলছি -নিশ্চয় তুমি আল্লাহ্, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা বুদ নেই, এবং মুহাম্মাদ' তোমার বান্দা ও রাসূল।

যদি একবার বলে তাহলে আল্লাহ তার চতুর্থাংশ জাহান্নাম থেকে

করেছেন তার বিবরণ, হা/১৮৮৪।

[1] . মসুলিম, অধ্যায়ঃ ঈমান, অনুচ্ছেদঃ যে সন্তুষ্ট হবে আল্লাহকে রব হিসেবে মেনে... হা/৩৪।

মুক্ত করে দিবেন, যদি দুবার বলে, তবে অর্ধেকাংশ, যদি তিনবার বলে, তবে দুতৃতীয়াংশ, আর যদি চারবার বলে, তবে তাকে সম্পূর্ণরূপে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিবেন।[1]

১১) আবদুল্লাহ বিন গান্নাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যে ব্যক্তি সকালে পাঠ করবেঃ

اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِن نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা মা আসবাহা বী মিন নি'মাতিন ফামিনকা ওয়াহদাকা লা-শারীকা লাকা ফালাকাল হামদু ওয়া লাকাশ্ শুকরু। অর্থঃ 'হে আল্লাহ্ আমার সাথে যে নে'য়ামত সকালে উপণিত হয়েছে তা সবই একক ভাবে তোমার পক্ষ থেকে, তোমার কোন শরীক নেই। সুতরাং কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা মাত্রই তোমার জন্য।

তবে সে ঐ দিনের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে, আর যে ঐ দুয়াটি সন্ধ্যায় বলবে, সে রাতের কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।[2]

১২) ইবনে ওমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকালে ও সন্ধ্যায় এই দুয়াটি পাঠ করা ছাড়তেন নাঃ

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي

---

[1]. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া বলবে। হা/ ৫০৬৯। আরো বর্ণানা করেছেন, নাসাঈ আমালুল ইউমা ওয়াল লাইল গ্রন্থে ১/১৩৮।

[2]. আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া বলবে। হা/ ৫০৭৩। আরো বর্ণানা করেছেন, নাসাঈ আমালুল ইউমা ওয়াল লাইল গ্রন্থে ১/১৩৮। সুনান নাসাঈ কুবরা হা/৯৮৩৫।

أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفِي وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَن أُغْتَالَ مِن تَحْتِي

অর্থঃ হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি, হে আল্লাহ্ আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমার এবং আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তা। হে আল্লাহ্ আমার গোপন বিষয় সমূহ (দোষ-ক্রুটি) ঢেকে রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার সম্মুখ থেকে,পিছন থেকে,ডান দিক থেকে,বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে। আর তোমার মহত্মের উসীলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধসে আমার আকষ্মিক মৃত্যু হওয়া থেকে।[1]

১৩) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দুয়াটি দশবার বলবেঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু,লাহুল

---

[1] . আহমাদ, ২/২৫। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া বলবে। হা/৫০৭৪। নাসাঈ, অধ্যায়ঃ আশ্রয় প্রার্থনা, অনুচ্ছেদঃ ভুমি ধস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা, হা/৫৫২৯। ইবনে মাজাহ, হা/৪০০৪।

মুলকু ওয়ালাহুল হামদু,ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব,তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

বিনিময়ে তার জন্য একশতটি নেকী লিখা হবে, একশতটি গুনাহ মোচন করা হবে, একজন কৃতদাস মুক্ত করার ছওয়াব পাবে,সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত শয়তান থেকে তাকে নিরাপদ রাখা হবে। যদি সন্ধ্যার সময় অনুরূপ বলে, তবে একই প্রতিদান দেয়া হবে।[1]

১৪) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় তিনবার এই দু'আটি পাঠ করবে,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থঃ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে –তাঁর সৃষ্টির সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে।

সে রাতে বিষাক্ত কোন কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না।"[2] অর্থাৎ– সাপ–বিচ্ছু ইত্যাদি বিষধর প্রাণী দ্বারা তার ক্ষতি হবে না।

১৫) খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

'যে ব্যক্তি কোন স্থানে (রাত কাটানোর জন্যে) অবস্থান করে আর এই দু'আটি পাঠ করে,

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

---

[1] . আহমাদ, ২/৩৬০।

[2] . আহমাদ, ২/২৯০। তিরমিযী, অধ্যায়ঃ দু আ, অনুচ্ছেদঃ আশ্রয় প্রার্থনার দুয়া। হা/ ৩৯৬৬।

আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তবে ঐ স্থান থেকে প্রস্থান করা পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারে না ।[1]

১৬) আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান বিন আবযী থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল বেলা এই দুয়াটি পাঠ করতেন,

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

উচ্চারণঃ আসবাহনা আলা ফিৎরাতিল ইসলামি, ওয়া আলা কালিমাতিল ইখলাসি, ওয়া আলা দীনে নাবিয়্যেনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা মিল্লাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফাম মুসলিমা, ওয়ামা কানা মিনাল মুশরিকীন।

অর্থঃ 'আমরা সকাল করেছি ইসলামের ফিৎরাতের উপর, একনিষ্ঠ বাণীর উপর,আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর ধর্মের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)এর মিল্লাতের উপর তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না'।[2]

১৭) আবদুর রহমান বিন আবু বাকরা থেকে বর্ণিত। তিনি তার

---

1 . মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির, দুয়া, ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ খারাপ ফায়সালা থেকে আশ্রয় কামনা। হা/২৭০৮।

2 . আহমাদ, ৩/৪০৬।

পিতাকে বলেন, আমি দেখছি আপনি প্রতি সকালে এই দুয়াটি পাঠ করছেনঃ

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী বাদানী,আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী সামঈ,আল্লাহুম্মা আ'ফেনী ফী বাসারী,লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ্! তুমি আমার দেহের নিরাপত্তা দান কর,শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তিকে নিরাপদ রাখ। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই'।

এই দুয়াটি সকালে তিনবার বলছেন আবার সন্ধ্যায় বলছেন তিনবার। আরো পাঠ করছেনঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ وَالفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরী ওয়াল ফাকরি,ওয়া আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি,লা-ইলাহা ইল্লা আনতা। 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরী ও দারিদ্র্য থেকে এবং আশ্রয় প্রার্থনা করছি ক্বরের আযাব থেকে। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই'।

এই দুয়াটিও সকালে তিনবার বলছেন আবার সন্ধ্যায় বলছেন তিনবার? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে বৎস! আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুয়াগুলো পাঠ করতেন। তাই আমি তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাইছি। তিনি বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন,বিপদ-মুসীবতে

আক্রান্ত ব্যক্তির দুয়া হচ্ছে এটিঃ

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ! তোমার করুণার আশা করছি, এক পলকের জন্য তুমি আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিও না। আমার সকল অবস্থা সংশোধন করে দাও। তুমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই।

তাই আমি চাই তাঁর সুন্নাতের অনুসরণ করি।[1]

এ ছাড়া প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উচিত এই দুয়াটি প্রত্যেক দিন সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করাঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

‘যে ব্যক্তি দিনে একশতবার পাঠ করবেঃ

لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু,লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু,ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব,তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

তাকে দশটি কৃতদাস মুক্ত করার ছোয়াব দেয়া হবে,তার জন্যে একশতটি নেকী লিখা হবে,একশতটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে,সন্ধ্যা

---

[1] . আহমাদ, ৩/৪০৬। আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ সকালে কি দুয়া বলবে। হা/৫০৯০। নাসাঈ, সুনান কুবরা হা/৯৮৫০, ১০৪০৭। বুখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে, হা/৭২২২

পর্যন্ত সারাদিন তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করা হবে। তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না। তবে সেই লোক ব্যতীত যে তার চেয়ে অধিক আমল করবে'।

'আর যে ব্যক্তি দিনে একশত বার বলবে, سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'। তার পাপ সমূহ মিটিয়ে দেয়া হবে, যদিও উহা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়'।[1]

---

[1] . বুখারী, অধ্যায়ঃ দুয়া, অনুচ্ছেদঃ তাহলীল পাঠ করার ফযীলত, হা/৫৯২৪। মুসলিম, অধ্যায়ঃ যিকির, দুয়া, ইস্তেগফার, অনুচ্ছেদঃ তাহলীল ও দুয়ার ফযীলত। হা/২৬৯১।

أدعية مختارة متنوعة

বিভিন্ন প্রকার নির্বাচিত দুয়া[1]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কথা হচ্ছে চারটিঃ سُبْحَانَ الله، وَالحَمْدُ لِله، وَلاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَالله أَكْبَرُ (সুবহানাল্লাহ্, ওয়াল হামদু লিল্লাহ,ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু,ওয়াল্লাহু আকবার)[2]

এই যিকিরটি খুব বেশী বেশী পাঠ করা উচিত, বিনয় ও অন্তরের উপস্থিতিসহ পাঠ করবে। এছাড়া কুরআন-হাদীছে যে সকল দুয়া বর্ণিত হয়েছে সেগুলোও বেশী বেশী পাঠ করা উচিত। বিশেষ করে আরাফাত দিবসে আরাফাতের মাঠে। গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক ফযীলতপূর্ণ কিছু দুয়া নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

* سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلَّا أنت سبحانك إنِّي كنت من الظالمين.

সুবহাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা, সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায যোয়ালিমীন।

আল্লাহর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করছি। মহান আল্লাহর

---

[1] মাজমু ফাতাওয়া ১৬/৬৯-৭৩।

[2] . মুসলিম, অধ্যায়ঃ আদব, অনুচ্ছেদঃ খারাপ নাম দিয়ে নামকরণ নিষেধ হা/২১৩৭। সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হাদীছে আছেঃ যে কোনটি প্রথমে বলবে কোন অসুবিধা নেই।

পবিত্রতা বর্ণনা করছি। তুমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি। নিশ্চয় আমি ছিলাম অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ।

* لَا إِلَـهَ إِلَّا الله، وَلَا نَعْبُـدُ إِلَّا إِيَّـاهُ لَـهُ النِّعْمَـةُ وَلَـهُ الفَـضْلُ وَلَـهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ

উচ্চারণঃ লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু লাহুন্নিয়মাতু ওয়ালাহুল ফাযলু ওয়ালাহুছ ছানাউল হাসানু,লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলেসীনা লাহুদ্দীন, ওয়ালাও কারেহাল কাফেরূন।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই। আর আমরা তাঁকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করি না। একমাত্র তাঁর অধিকারে সমস্ত নেয়ামত,তাঁরই জন্য সমস্ত সম্মান মর্যাদা,আর তাঁরই জন্য উত্তম স্তুতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন হক উপাস্য নেই। তার নিমিত্তে আমরা দ্বীন পালন করি একনিষ্ঠভাবে। যদিও কাফেররা তা মন্দ ভাবে।

* لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله

লা–হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।

আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত গুনাহ হতে বিরত থাকা ও আনুগত্য করার ক্ষমতা লাভ করা যায় না।

* رَبَّنَا آتِنَا فِي الـدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِـرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَـذَابَ النَّارِ.

রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল্ আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।

অর্থঃ 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে দুনিয়া ও

আখেরাতের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব হতে রক্ষা কর'। (সূরা বাকারা- ২০১)

* اللهـمَّ أَصْـلِحْ لَنـاَ دِيْنَنـاَ الـذِّيْ هُـوَ عِـصْمَةُ أَمْرِنـاَ، وَأَصْـلِحْ لَنـاَ دُنْيَانـاَ الَّتِـيْ فِيْهـاَ مَعاَشُـناَ، وَأَصْـلِحْ لَنـاَ آخِرَتَنـاَ الَّتِـيْ إِلَيْهـاَ مَعاَدُنـاَ، وَاجْعَلِ الْحَياَةَ زِياَدَةً لَناَ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَناَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ .

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের দ্বীনকে সংশোধন করে দাও যা আমাদের সকল বিষয়কে রক্ষাকারী। সংশোধন কর আমাদের দুনিয়াকে যাতে রয়েছে আমাদের জীবিকা। সংশোধন কর আমাদের আখেরাত যা আমাদের শেষ ঠিকানা। সবধরণের কল্যাণে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে দাও। আর মৃত্যুকে কর সবধরণের অকল্যাণ থেকে নিস্তার স্বরূপ।

* اللهـمَّ إِنـاَّ نَعُـوْذُ بِـكَ مِـنْ جَهْـدِ الْـبَلاَءِ، وَدَرْكِ الـشَّقاَءِ، وَسُـوْءِ الْقَضاَءِ، وَشَماَتَةِ الْأَعْداَءِ.

হে আল্লাহ্! আশ্রয় প্রার্থনা করি অসহনীয় কঠিন বিপদ থেকে, দুর্ভাগ্যবান হওয়া থেকে, মন্দ ফায়সালা থেকে এবং (আমার বিপদে) শত্রদের হাঁসা-হাঁসি থেকে'।

* اللهمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، وَمِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجالِ

'হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে, তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি অপরাগতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি ঋণের বোঝা ও মানুষের বলপ্রয়োগ থেকে'।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ،

হে আল্লাহ্ আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি,

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العفْوَ وَالعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي،

হে আল্লাহ্ আমি প্রার্থনা করছি তোমার কাছে ক্ষমার এবং আমার দ্বীন,দুনিয়া,পরিবার-পরিজন এবং সম্পদের নিরাপত্তা।

* اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِن بَيْنِ يَدَيَّ وَمِن خَلْفِي وَعَن يَمِينِي وَعَن شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَن أُغْتَالَ مِن تَحْتِي

হে আল্লাহ্ আমার গোপন বিষয় সমূহ (দোষ-ত্রুটি) ঢেকে রাখ এবং আমাকে ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে হেফাযত কর আমার সম্মুখ থেকে,পিছন থেকে,ডান দিক থেকে,বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে। আর তোমার মহত্ত্বের উসীলা দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নিম্ন দিক থেকে মাটি ধসে আমার আকষ্মিক মৃত্যু হওয়া থেকে।

* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي

আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী খাত্বীয়াতী ওয়া জাহ্‌লী ওয়া ইসরাফী ফী আমরী ওয়া মা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী,

অর্থঃ 'হে আল্লাহ আমার পাপরাশী ক্ষমা করে দাও,আমার মূর্খতা ও আমার কাজ-কর্মের বাড়াবাড়ি মাফ করে দাও। আরো ক্ষমা কর যা তুমি আমার চাইতে বেশী জান।

* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي وَخَطَئِي وَعَمْدِي وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي

আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী জাদ্দী ওয়া হাযলী ওয়া খাত্বাই ওয়া আ'মাদী ওয়া কুল্লু যালিকা ঈনদী।

হে আল্লাহ্‌ আমার দৃঢ়ভাবে ও হালকাভাবে কৃত পাপ ক্ষমা করে দাও এবং ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পাপ ক্ষমা কর। আর আমার পক্ষ থেকে কৃত সকল কিছু মাফ করে দাও।

* اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী মা ক্বাদ্দামতু ওয়া মা আখখারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আ'লানতু ওয়ামা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী আন্তাল মুক্বাদ্দেমু ওয়া আন্তাল মুআখেখরু ওয়া আন্তা আলা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

হে আল্লাহ্‌ আমি যা আগে করেছি যা পরে করেছি যা গোপনে করেছি যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা তুমি আমার চাইতে বেশী জান সব ক্ষমা করে দাও। তুমিই প্রথম তুমিই শেষ এবং তুমি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান'।

* اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَسْـأَلُكَ الثَّبَاتَ فِـي الْأَمْـرِ وَالْعَزِيمَـةَ عَلَـى الرُّشْـدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَـادِقًا وَأَسْـأَلُكَ مِـنْ خَيْـرِ مَـا تَعْلَـمُ وَأَعُـوذُ بِـكَ مِـنْ شَـرِّ مَـا تَعْلَـمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ.

হে আল্লাহ! তোমার নিকট সকল বিষয়ে দৃঢ়তা চাই, সঠিক পথের উপর অটলতা চাই। চাই তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা এবং তোমার ইবাদত সুন্দরভাবে করার তাওফীক। তোমার কাছে চাই বিশুদ্ধ অন্তর ও সত্য কথা বলার ক্ষমতা। আমার জন্য যে কল্যাণ তুমি জান তা চাই তোমার কাছে। আমার জন্য যে অকল্যাণ তুমি জান তা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। আমার যে সকল অপরাধের কথা তুমি জান, তা থেকে তোমার কাছে ক্ষমা চাই। নিশ্চয় তুমি অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।

* اللهُـمَّ رَبَّ النَّبِـيِّ مُحَمَّـدٍ عليـه الـصَّلاة والـسَّلام ، اغْفِـرْ لِـي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِي، وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا.

হে আল্লাহ! হে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পালনকর্তা! আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। আমার অন্তরের ক্রোধকে দূর করে দাও। যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে বিভ্রান্তিকারী ফিতনা থেকে রক্ষা কর।

* اللَّهُـمَّ رَبَّ الـسَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَـرْشِ الْعَظِـيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ

الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ

হে আল্লাহ! আকাশ মণ্ডলীর পালনকর্তা, পৃথিবীর পালনকর্তা, মহান আরশের পালনকর্তা। আমাদের পালনকর্তা, সকল বস্তুর পালনকর্তা। তুমি বীজ ও আঁটি অঙ্কুরকারী, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন নাযিলকারী। তুমিই অনাদি তোমার পূর্বে কেউ নেই। তুমিই অনন্ত তোমার পর কেউ নেই। তুমিই প্রকাশ্য তোমার উপর কেউ নেই। তুমিই গোপন তোমার পরে কিছু নেই। আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং দরিদ্রতা থেকে রক্ষা কর।

* اللهم آتِ أَنْفُسنَا تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আতে নাফসী তাক্বওয়াহা,ওয়া যাক্কিহা আন্তা খায়রু মান্ যাক্কাহা,আন্তা ওলিয়্যুহা ওয়া মাউলাহা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ আমার আত্মাকে দান কর তাক্বওয়া,তাকে পবিত্র কর। তুমিই তাকে উত্তম পবিত্রকারী। তুমিই তার বন্ধু,অভিভাবক।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

হে আল্লাহ! অপারগতা ও অলসতা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। কাপুরুষতা, অতিবার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই।

* اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ أَنْ تُضِلَّنِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ.

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আত্মসর্ম্পন করেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি, তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি, তোমার নামেই ঝড়গা করি। তোমার ইজ্জতের কাছে পানাহ চাই, আমাকে বিভ্রান্ত করো না। তুমি ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তুমি চিরঞ্জিব, যার কোন মৃত্যু নেই। জিন, ইনসান সবাই মৃত্যু বরণ করবে।

* اللهـمَّ إنـاَّ نَعُـوْذُ بِـكَ مِـنْ عِلْـمٍ لاَ يَنْفَـعُ، وَقَلْـبٍ لاَ يَخْـشَعُ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَدَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهاَ.

'হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করি এমন জ্ঞান থেকে যা কোন উপকার দেয় না, এমন হৃদয় থেকে যা ভীত হয় না, এমন আত্মা থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ থেকে যা কবূল করা হয় না'।

* اللَّهُـمَّ إِنِّـي أَعُـوذُ بِـكَ مِـنْ مُنْكَـرَاتِ الْأَخْـلَاقِ وَالْأَعْمَـالِ وَالْأَهْوَاءِ.

হে আল্লাহ! খারাপ চরিত্র, খারাপ আমল, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

* اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াতের পথ দেখাও। আমার নফসের অনিষ্ট থেকে আমাকে পানাহ দাও।

* اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

হে আল্লাহ! তুমি যা হারাম করেছো তা থেকে বাঁচিয়ে তোমার হালাল বস্তু আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্য সবার মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখ।

* اللهم إني أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল্ হুদা ওয়াত্ তুক্বা ওয়াল্ আফাফা ওয়াল গিনা।

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি চাই হেদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অভাব মুক্তি।

* اللَّهم إنِّي أسألك الْهُدَى وَالسَّدَادَ.

হে আল্লাহ তোমার নিকট চাই হেদায়াত ও সঠিক পথ।

* اللهمَّ إناَّ نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عاجِلِهِ وَآجِلِهِ، ماَ عَلِمْناَ مِنْهُ وماَ لَمْ نَعْلَمْ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عاجِلِهِ وَآجِلِهِ، ماَ عَلِمْناَ مِنْهُ وَماَ لَمْ نَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ

আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিনাল খাইরে কুল্লিহি আ'জলেহি ওয়া আজলিহ,মা আ'লমেনা মিনহু অমা লাম না'লাম। ওয়া নাউযুবকিা মিনাশ্ শাররি কুল্লিহি আ'জলেহি ওয়া আজলিহি, মা–

আলেমনা মিনহু অমা লাম না'লাম। ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা সাআলাকা মিনহু আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মাস তাআযা মিনহু আবদুকা ওয়া নাবিয়্যুকা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ আমরা আপনার কাছে বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় কল্যাণ- যা আমরা জানি এবং জানি না- তা সবই প্রার্থনা করছ। বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় অকল্যাণ- যা আমরা জানি এবং জানি না- তার সবগুলো থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি সেই কল্যাণ চাই যা তোমার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার নিকট চেয়েছেন। সেই অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই যা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছেন তোমার বান্দা ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا.

হে আল্লাহ! তোমার কাছে জান্নাত চাই এবং এমন কথা ও কাজের তাওফীক চাই যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে দিবে। তোমার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং এমন কথা ও কাজ থেকে আশ্রয় চাই, যা জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দিবে। তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমার জন্য তোমার প্রতিটি ফায়সালাকে কল্যাণকর করে দাও।

* لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

يحيي ويميت بيده الخير وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلَّا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي العظيم.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু,লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু,য়ুহয়ি ওয়া য়ুমীতু বি ইয়াদিহিল খাইরু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর।

সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়্যুল আযীম।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন হক উপাস্য নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। তারই জন্য রাজত্ব,তারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ। তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ,কামা সাল্লায়তা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা,ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ,কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা,ইন্নাকা

হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর ঐরূপ রহমত নাযিল কর যেরূপ নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর,নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত নাযিল করেছিলে ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর,নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।

* رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াকিনা আযাবান্নার।

গুরুত্বপূর্ণ এই পবিত্র স্থানে সকল হাজীর উচিত হচ্ছে উল্লেখিত দুয়া ও যিকিরগুলো বারবার পাঠ করা। এছাড়া আরো অন্যান্য দুয়া-যিকিরও পাঠ করতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উপর দরূদ পড়বে। কাকুতী-মিনতি করে দুয়া করবে। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ প্রার্থনা করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দুয়া করতেন, তখন এক দুয়া তিনবার বলতেন। তাই তাঁর অনুসরণ সকলেরই করা দরকার।

নির্বাচিত এই দুয়াগুলো শেষ হওয়ার মাধ্যমে যে সকল বিষয়ের জ্ঞান সংকলন করার ইচ্ছা আমরা করেছিলাম তা শেষ হল।

সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী আজমাঈন।